Anjali

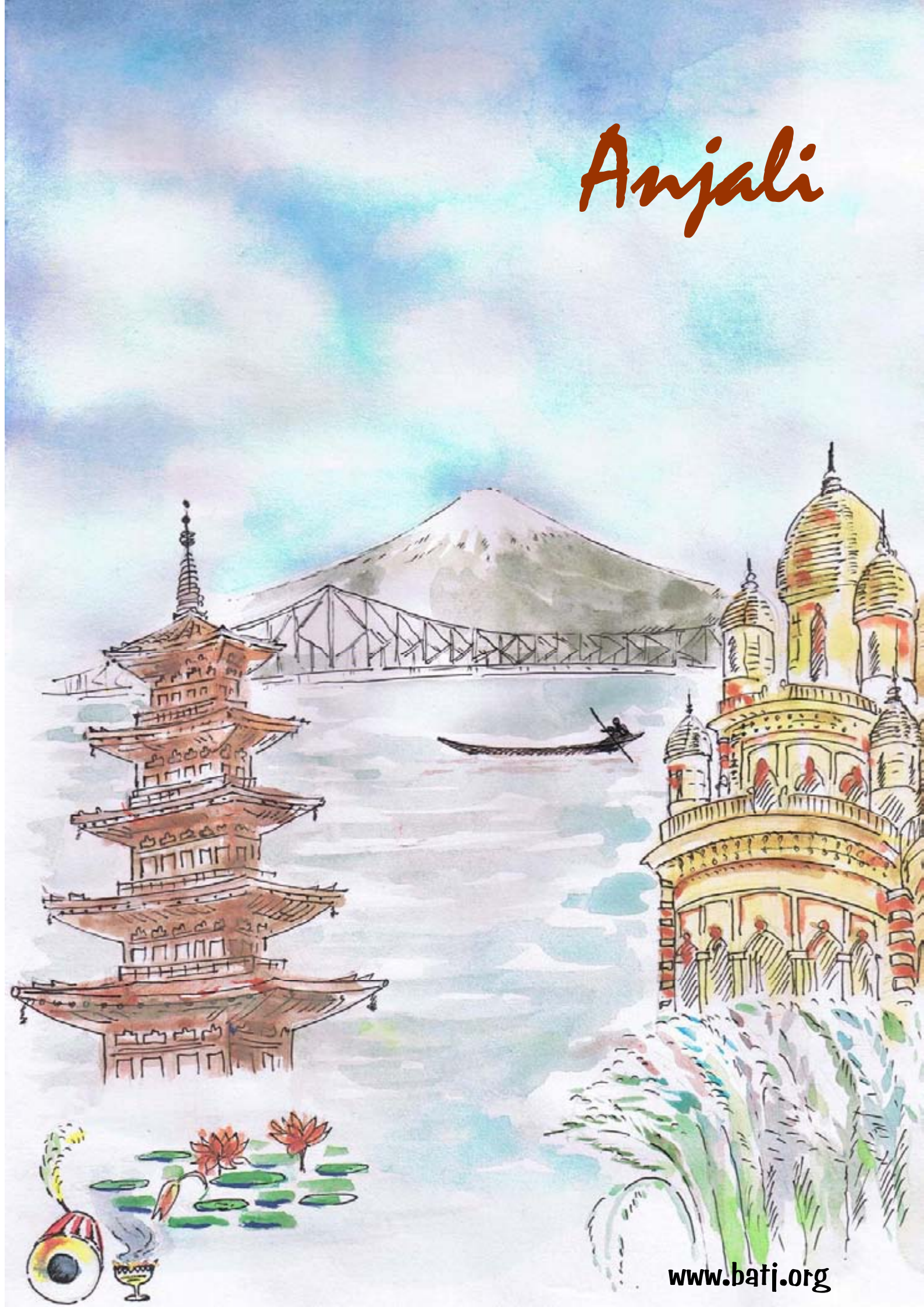

www.batj.org

Come, fly with us.

When it is time to go home....
To return to your roots ....
To visit family and childhood friends....

Come, fly with us.

Follow your heart home. To India.
With our warmth and care.
We shall give you the perfect homecoming.

Come, fly with us.

AIR-INDIA

TEL: FOR RESERVATIONS 03-3508-0261 PASSENGER SALES 03-5157-5593

Lead us from the untruth to the truth
Lead us from darkness to the light
Lead us from fear of death to
knowledge of immortality.

असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय।

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

No. 975-P/CM
21 September, 2007

I am happy to know that the next issue of 'Anjali' will be brought out in October, 2007. This issue, I am sure, will highlight the cultural and social activities of the Indian community in Japan.

I wish the publication all success.

(Buddhadeb Bhattacharjee)

Durga Puja Program October 20, 2007

Puja	… 11:00 AM
Anjali	… 12:00 Noon
Prasad & Lunch	… 12:30 PM
Cultural Program	… 2:30 PM
Puja & Arati	… 5:00 PM

Cultural Programme **2:30 ~ 5:00 PM**

Ode to Autumn	Chorus
Dance Performance	Sutapa Talukdar and her troupe from India
Puja Song	Tannistha
Folk dance	Manjari, Sneha, Saumyadip, Subhankar, Tuhin
Saat bhai champa Based on a popular fairy tale - A king has two wives but no children, when the younger queen gives birth to seven boys and one girl the jealous elder queen buries the new born babies in the corner of a garden, where magically they blossom into flowers while the whole land is barren and is reunited with the king and their mother	Aneek, Akash, Amartya, Arpan, Arsh, Arunansu, Aishwariya , Mahak, Nishant, Joy, Rene, Riju, Tuhin, Utsha,
Dance	Harshita ChivuKula, Monalisa Das, Shreya Das, Shalmali Gadgil, Subhashree Mahadevan
O nadi re A compilation of songs directly and symbolically connecting with the theme "river" and the boatman	Anjelika Sen, Anindya Bhattacharrya, Bhaswati Ghosh, Debarati Bose, Nandika Misra, Reetu Das, Sagarika Das, Samudra Dutta Gupta, Sandip Sen, Suparna Bose, Tuli Patra, Viswa Ghosh, Masanori Hisamoto
Music Interlude	Sanjib Chanda
Melody Queens of yester years	Debarati Bose, Soma Choudhury, Meeta Chanda
Closing Dance	Piyali Bose
Master of Ceremonies	Nandini Basu & Poolak Bandopadhyay

Program coordinated by Rita Kar

Venue: Curian Hall 7th Fl.,Event Room, 5-18-1, Higashi-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0011, Tel.: 03-5479-4100

सत्यमेव जयते

AMBASSADOR OF INDIA
TOKYO

11 September, 2007

MESSAGE

I am happy to learn that Durga Puja is being performed in Tokyo on 20th October, 2007.

Coming as this does during the ongoing India-Japan Friendship Year 2007, this is a special occasion for all of us.

This Durga Puja celebration provides an opportunity to share the richness and diversity of Indian culture with our Japanese friends.

I am confident that this event will further strengthen the deep ties of mutual understanding and friendship between the people of India and Japan.

I would like to extend my warm greetings and best wishes to all members of the Indian Community on the joyous occasion of Durga Puja celebrations, 2007.

H.K. Singh

(H. K. Singh)

সম্পাদকীয়

ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির ৫০তম পূর্তিবর্ষ উপলক্ষ্যে, ২০০৭ সাল ভারত-জাপান মৈত্রী বর্ষ রূপে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। সেই উপলক্ষ্যে জাপানে বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ভারত সরকার। আশা করা যায়, এর দ্বারা জাপানে ভারতবর্ষের পরিচিতি আরও বাড়বে। একই উদ্দেশ্যে জাপানও ভারতবর্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রয়াসের ফল যাতে সুদূরপ্রসারী হয় তার জন্য উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি নাগরিকের কিছু কর্ত্তব্য আছে। শুধু কয়েকটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিচিতি সম্ভব। কিন্তু এই প্রাথমিক পরিচিতির সীমা অতিক্রম করে মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলতে হলে জানার পরিধি এবং গভীরতা দুয়েরই অনেক ব্যাপ্তির প্রয়োজন। দুই দেশকে গভীরভাবে জানার চেষ্টা অনেকেই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে ৯১ বছর আগে জাপান সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন করেছেন, তা একাধারে যেমন আজও প্রযোজ্য , তেমনি এও সত্যি যে সেই অন্তর্দৃষ্টিকে অনুধাবন করে তার থেকে শেখার চেষ্টা এখনও সীমিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞান আহরণ করে কিভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়, জাপানী চরিত্রের এই বলিষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রত্যেকটি শিক্ষিত ভারতবাসীকে জাপানের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আজও কি আমরা সেই নির্দেশের সঠিক মাহাত্ম্য অনুভব করি? বৌদ্ধধর্ম তথা ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হাজিমে নাকামুরার নামই বা ক'জন জানি! জাপান ভারত সংস্কৃতির কর্ণধার এবং আজীবন ভারতপ্রেমী এই মানুষটির সঠিক মূল্যায়ন ভারত-জাপান মৈত্রীর বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অঞ্জলি কোনও মাসিক পত্রিকা নয়, ভারতীয় সমাজের কোনও মুখপত্র তো নয়ই। সাধারণত এই ধরনের অপেশাদারী পত্রিকার কাছে পাঠকদের চাহিদা খুবই কম। তবুও, মৈত্রী বর্ষকে সফল করে তোলার প্রয়াসে সামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে এবছরের অঞ্জলিতে কয়েকটি বিশেষ নিবেদনের উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই উপস্থাপনা পাঠকদের কাছে গ্রহনযোগ্য হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

দুর্গা পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই পত্রিকার প্রকাশ। তাই এই পত্রিকাতে পূজার সার্বজনীন আবেদনকেও গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে, এইজন্য তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়'। অঞ্জলির আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি কিনা তার বিচারের ভার পাঠকদের। আয়োজনে ভুলত্রুটির জন্য আমরা সকলের কাছে বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদকমন্ডলীর তরফ থেকে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শারদীয়া শুভেচ্ছা॥

From the editorial desk

This year, 2007, marks the 50th anniversary of an agreement on cultural exchanges between India and Japan and has accordingly been designated as Indo-Japanese friendship Year. To commemorate the occasion, the Government of India has arranged a variety of cultural programs in Japan that, hopefully, will deepen this country's understanding of India. At the same time, Japan is playing its role in coming closer to the Indians through similar programs right now being staged in India. A very commendable bilateral effort, no doubt, but is one that needs to be supplemented by wider participation of the citizens of the two countries. A few evenings of cultural events offering a glimpse of our cultural inheritances can result in at best a nodding acquaintance. Beyond the limits of what such cursory glances may reveal stretches a territory access to which demands deeper probing and a great deal of pushing forward. Some did aspire to explore into the tantalizing legacy enduring on the other side. Tagore's evaluation of Japan 91 years ago is still relevant, though few seem capable of appreciating its significance today. Swami Vivekananda advised his countrymen to observe Japan's persistent drive in acquiring knowledge from across the frontiers to enrich itself without sacrificing its own individuality. Today do we even really understand the importance of such messages from the best among us? And, how many of us have heard of Hajime Nakamura? A proper appreciation of the mission of this great scholar will go a long way in strengthening the bond of friendship between the two countries.

Anjali is not a periodical, nor indeed a forum of the Indian residents of Japan. Readers normally expect little from a literary effort of its type, one with no professional support. However, this year its contents are expected to draw the readers' attention to the importance of the Indo-Japanese friendship year. We will consider ourselves amply rewarded if Anjali 2007 touches their hearts.

In the years since it made its first appearance, Anjali has succeeded in carving a niche for itself --- it's now an indispensable organ of our puja celebration. We haven't, therefore, overlooked the importance of making it universally readable. "Puja is an expression of what is more profound than itself," wrote Tagore. "It's for this reason that there is beauty and truth, and not merely pomp, in the way it is conducted." It's for our readers to judge how far our efforts have achieved beauty and truth. We acknowledge our lapses, though, and request our readers to accept our apologies.

Our editorial group extends its greetings to all the participants in the puja.

Contents

সম্পাদকীয়
From the editorial desk

Indo-Japan Friendship year **….9**

What Indian people should learn from Japan's experience – Tsuyoshi Nara …11
Pioneering the Indo-Japanese Relationship – Swami Medhasananda …14
'জাপান যাত্রী' কে ফিরে দেখা – ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত) …23
ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রবিদ নাকামুরা হাজিমে – কল্যাণ দাশগুপ্ত …26

Story, Travelogue, Feature, Poetry **….28**

স্বপ্ননীল আকাশ – মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত) …29
বিচ্যুতি – শঙ্কর বসু …32
ইয়ু-র নর্তকী – রুমা গুপ্ত …35
ক্ষুদ্‌দার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা – অনুপম গুপ্ত …42
বিওয়া হ্রদ ভ্রমণ – কাজুহিরো ওয়াতানাবে …44
আমার টোকিও দর্শন – নির্মল কুমার সিনহা …46
Shakti and Science – Virendra Shanker …47
शिव और शक्ति – ईलाशंकर …49
Win-Win – Pradipta Mullick …50
The Durga Puja – its Symbolism – Abbagani Ramu …52
Snippets on Buddhism's demise and
possibility of revival in the land of its birth! – Biswa Ghosh …54
পথে চলে যেতে যেতে – শ্রীমতী সীমা ঘোষ (উকীল) …56
চেতনার রং – শতরূপা ব্যানার্জী …57
ঐ যে মানুষটা – রফিকুল ইসলাম …58
উত্তরের জন্য ছুটি .... – ইমরোজ নাওয়াজ রেজা …58
The Ultimate Truth – Angelika Sen …59
Childhood – Dipyaman Sinha …59
অমৃতের সন্ধানে – নমিতা চন্দ …60
এই তো জীবন! – খগেন্দ্রনাথ জুঁই …60
জাপানে এসে – সুপর্ণা বোস …60
गीत नया – चन्द्रिका जोशी …61
आहट शरद की – वायला सिंह …61
अपने को मिटाना सीखो – सुरेश ऋतुपर्ण …62
एक दिन – सुरेश ऋतुपर्ण …63
Embarrassments of Forgetting – Sougata Mallik …64
Are the Japanese and the Bengalis Related? – Nandini Basu …66
Pujas – near & distant – Arijit Basu …67
子育ての行方 – 山田 さくら …68
The Japanese Local Food "Kyodoryori" – Miki Sarkar …70
Encounter to Kantha Embroidery – Miki Yoshida …72
カルチャー…食?– チャットパダイ　啓子 …75
「集中」の度合い – 羽成　孝 …76
インドの生活における「地域力」– ラキット工藤昭子 …77
アシールバドゥ – スデブ・チャットパダイ …80

Book Review – Sahanaz Reza **….81**

জাপান দেশে – আমার ঘরে
জাপানি হাইকু
অরণ্যের রাজবাড়ি
インドの風・日本の風

Young budding stars Section: **….85**
New Arrivals …86

Drawings **….87**
The Sun by Rajarshi …87
The Shinkansen by Tuhin …87
The Lion's Cub by Utsa …88
The Elephants on walk by Akash …88
The Players by Riju …89
The Potrait by Rishi …89

Features **….90**
Beach Resort – Nishant Chanda …90
Summer Vacation in Italy – Arunanshu Patra …91
My visit to a Fireworks show – Renee Ghosh …91
My fun Camp – Aishwarya Kumar …92
Seasons – Shreya Das …92
All about the Anaconda – Saptarshi Nath …93
My Trip to Nagano – Aneek Nag …94
Haiku Poem – Bikramjit Basu …95
A Fairy – Rajdip Sen …95
My Trip to Toyota Factory – Monalisa Das …96
The Pharaoh's Curse – Tannishtha Roychoudhury …97
Oil Slick – Ricky Dasdeb …101
A Courageous Woman – Devdip Sen …103
Guess Who? – Proma Banerjee …104
How Alcohol Affects the cells functioning – Mimi Mallik …105
Twenty-20 Cricket – Arindrajit Basu …106
Indian Film Culture – Shoubhik Pal …108
The values of a Family – Reimi Dasdeb …110
Five simple steps to manipulate your parents mind – Moon P …112
Aid to LEDC's – Ritwik Ghosh …114
Freedom – Udita Ghosh …115

Arts **….116**
Rose and Orchid – Mrinalini Singh …116
Twin Roses and Fragrance – Sanchita …117
Serenity – Meeta Chanda …118
Cat on hunt – Mimi Dhar …118
Land of rising sun – Sushmita Pal …119
Cranes – Meeta Chanda …119

Puja Fundamentals …120
Pujo Maane (Perception) …122

Statement of Accounts **…145**
Special Thanks **…146**
Acknowledgements **…147**

Indo Japan Friendship

Indo Japan Friendship

What Indian people should learn from Japan's experience

Tsuyoshi Nara

The year 2007 being 'Indo-Japan Friendship Year', many cultural exchange programs are now in full swing between the two countries. Many eminent Indian artists are visiting various cities in Japan to present to Japanese audiences their excellent performances in song, dance and the playing of musical instruments. Meanwhile, many first-class Japanese artists are visiting India to demonstrate their traditional skills and explain their cultural precepts to Indian audiences. In addition, a large number of Indian politicians, government officers, businessmen and even military personnel are calling on their respective Japanese partners and vise versa.

It is indeed gratifying me to observe these phenomena as I have been always dreamt of realizing such exchanges during my last half-century's association with India. However, to tell the truth, in spite of my constant efforts to persuade Japanese politicians and businessmen to take more interest in Indian affairs, I used to encounter very poor responses or even indifference. It was not until two or three years ago that these people started to change their attitudes and begin showing their real interest in Indian politico-economic affairs, and this was largely a result of the remarkable economic progress they observed particularly in Indian IT.

The main reason for their negative attitude in the past was their biased perception of Indian economic conditions.

(1) Lack of sufficient infrastructure (roads, railways, sea/air port facilities and electricity).
(2) Frequent labor trouble.
(3) Government policies unfavorable or unfair to foreign investors.
(4) Selfish attitudes of shrewd Indian business partners.

However, these reasons are nothing but a pretext to conceal their lack of entrepreneurial spirit in opening up a new business field in India. In fact, we can cite successful examples of some pioneer companies like Suzuki Motor Corporation (Japanese company) and Samsung Co. Ltd. or Hyundai Motorcar Manufacturing Co. Ltd. (Korean company) that overcame the hurdles presented by Indian economic conditions.

Contrary to the situation mentioned above, we can see a completely different picture in the Japanese academic circle. Many Japanese scholars, young and old, have shown keen interest in various aspects of Indian affairs, becoming specialists in Indian language, literature, arts, history, philosophy, religion, society and more. They number something over 500 now, though that figure was less than 50 in the past when I first landed in Calcutta after a month journey by British-Indian cargo-cum-passenger ship from Yokohama in 1958. On the other hand, to my knowledge the number of Indian scholars currently specializing in Japanese affairs can hardly exceed 20. Nowadays some economists predict that India's population will soon become the largest one in the world surpassing that of China and her GDP will exceed Japan's GPO within a few decades. While I myself do agree with this prediction, yet I wonder whether the aforementioned

cultural or academic imbalance between the two countries will ever be rectified at all.

This remark is not based on patriotic sentiment but rather on my brotherly concern for the future of the Indian people. To speak more precisely, I do not want to see the Indian nation to repeat the same mistakes as the Japanese committed during her postwar development. I sincerely wish that many Indian scholars would study thoroughly the whole process of Japan's postwar socio-economic development occurred under the influence of the American regime.

Immediately after the end of Second World War in 1945, the socio-economic infrastructure of Japan was totally transformed based on instructions from the US occupation. Dissolution of the big financial combines (=zaibatsu), abolition of the aristocratic class privileged by the state, revolutionary agrarian reform by compulsory transfer of agricultural land from big landowners to landless laborers, reform of the school system and other major changes were enforced on us one after another, not to mention the changing of our Constitution.

During the first stage of postwar development (1945-1954), for the sake of securing minimum required food, the Japanese people put all their energy into rehabilitating the industrial and agricultural infrastructure totally destroyed by daily air attacks by American bombers during the war time. During the second developmental stage (1955-1964), they worked very hard day and night to earn enough money for clothing and housing. During the third stage (1965-1974), they worked still harder to increase their income and succeeded in doubling it. As a result most Japanese people became able to purchase any sort of durable or non-durable consumer goods produced either domestically or in any foreign country – particularly in the U.S.A. In those days it was indeed a dream for any Japanese to purchase American products which looked like celestial goods to their eyes.

Thus, almost every Japanese family started purchasing modern fashionable goods to furnish their small houses or apartments and make a more comfortable life. To meet such customers' demands, every manufacturer, big or small, started increasing its production and merchants intensified their sales of various merchandise by promoting commercial advertising through various media. TVs, electric cleaners, washing machines, refrigerators, air-conditioners, pianos, motorcycles and motorcars became daily necessities for virtually every Japanese family. While such a dynamic industrial development and economic progress brought about material satisfaction and physical enjoyment to Japanese people dreaming of matching the American lifestyle, it also thrust a harsh reality before them. Namely they were confronted with various pollutions. Air pollution due to flue gas extraction or engine exhaust, water pollution due to factory waste or domestic waste, and soil pollution due to excess use of chemical fertilizer or insecticide/pesticide – all became serious threats to health. Thousands of people died and many more people still suffer from aftereffects of various diseases caused by the abovementioned agro-industrial pollution.

As many industrial, commercial and financial concerns made enormous profits, both their CEOs and employees were benefited from constant increases in remuneration or salary. In this way Japan became the second largest economic giant in the world next to the U.S.A. and secured the honorable position of providing techno-economic aid to the developing nations. Japan's annual per-capita income surpassed that of Americans and their individual savings became the highest in the world. But the story did not end there. Alas! A sad story started when a majority of Japanese people were not content with their savings or earnings but became avaricious, seeking to earn or save even more money. The most pathetic part of this story is that many

pursued their greedy desires even by easy but dishonest means.

They committed many shameless acts including insider trading, corporate donations to politicians or government officials for unfair allotment of public works and expenditures, embezzlement of public money, even dishonest anti-earthquake designs and perfunctory inspections. Dishonesty has become rampant throughout the Japanese society. Furthermore, some Japanese people irritated by low bank interest withdrew their savings from the bank and invested them in the stock market or for a real estate. Youth did everything possible to avoid physical labor like agriculture and construction work preferring white-color desk jobs, which resulted in rapidly diminishing agricultural populations in most rural areas. The Japanese seem to have totally forgotten or given up their spirit of hardworking and honesty and yield to the temptation to get rich quickly. They have even started thinking that the more money they accumulate the more they can secure their happiness. They now consider that the value of a human being can be measured by the amount of money he or she possesses. This is exactly the way a majority of American people value human beings. Thus, many Japanese people have adopted American ways of thinking and lifestyles exactly as the U.S.A. occupation once sought to enforce.

After the Second World War, the Japanese society became for a time an ideal egalitarian society as almost all Japanese people considered themselves to be the middle class. It is now shifting to a quasi-American model society consisting of two classes of people – the rich minority and the poor majority. There are still a good number of Japanese people who are honest, kind, diligent, clean, esthetic and pious. It is also a fact that the average span of life and the literacy rate of the Japanese nation ranks topmost in the world. It is pity, therefore, to have to admit the recent deterioration of the Japanese character observed recently – particularly during a last two or three decades.

Our challenge now is to reverse the present current flow of the Japanese society and restore the dignity of our traditional self-respect. For that purpose the Japanese should first remember and restore their two traditional ethical principles in their minds and daily conduct– i.e. (1) tusutushimi (= humbleness/ prudence/ contentedness) and (2) mottainai(=frugality/ waste nothing and be grateful to the Creator).

As stated earlier, I wish to repeat here sincerely that the Indian people, who seem to be following a course of fast economic progress similar to that the Japanese once pursued, should learn a lesson from the latter lest they commit the same blunder.

Pioneering the Indo-Japanese Relationship

Swami Medhasananda

On May 31, 1893, an unknown Hindu monk boarded the ship 'Peninsular' sailing from Bombay bound for Japan. His final destination, however, was Chicago, where he was going to represent Hinduism at the World Parliament of Religions to be held there on September 11.

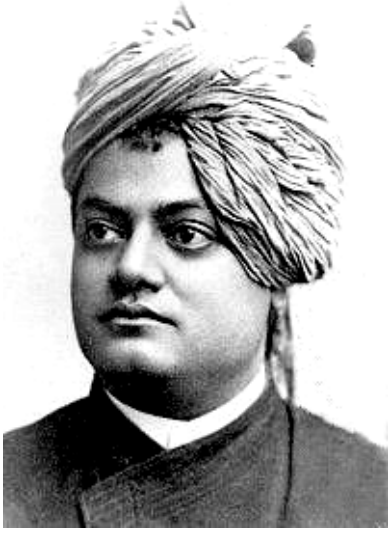

Swami Vivekananda

"The ship, the farewells, the uncertainties and formalities of foreign travel, and so many belongings to care for - all these were new to him. Then too, his friends had made him dress in a robe and turban of silk. Like a prince he looked, indeed, but in his heart stirred various emotions. The monk stood on deck and gazed toward the shore until it faded from sight, sending his blessings to those who loved him and whom he loved ... "

"From Bombay the ship next stopped at Colombo and then on to Penang, a strip of land along the sea in the body of the Malay Peninsula. On his way from Penang to Singapore, he caught glimpses of Sumatra, with its high mountains, and the captain pointed out to him several favorite haunts for pirates in days gone by. The next port was Singapore, then the capital of the straits settlements, where he went to see the museum and the Botanical Garden with its beautiful collection of palms ... Next the ship stopped at Hong Kong, giving him his first glimpse of China ... The halt of three days at Hong Kong gave the passengers an opportunity to visit Canton, eighty miles up the Sikiang River ..."[1]

Canton proved to be a revelation to the monk. From Hong Kong the ship sailed to Nagasaki in Japan, where he was greatly impressed with everything he saw. This unknown monk who now stood on Japanese soil - I believe readers have already guessed - is Swami Vivekananda, to whom we shall henceforth refer to as Swami or Swamiji.

On the momentous occasion of the celebration of India-Japan friendship year 2007, this article attempts to study the role the Swami played in this relationship – a role that started with his visit to Japan in 1893. We understand that Swamiji was the first among many prominent personalities of Modern India to visit Japan, and he was also the first to foster relationships with Japan which would benefit India materially and Japan spiritually.

A visit by the Swami Vivekananda to any country whatsoever, including Japan, is important, for he was not just a religious leader, but most decidedly a prophet of this age. The impact of his life and teachings was felt not only in the field of spirituality, but in other fields by every thinker or leader of late nineteenth- and early twentieth century India, including Gandhiji, the poet Rabindranath Tagore, the savant Aurobindo and the scientist Jagadish Chandra Basu, freedom fighter Netaji Subash Chandra Basu[2]. World thinkers and writers like Leo Tolstoy, Romain Rolland and Arnold Toynbee were also influenced in one way or another by Swamiji[3].

Japan was sanctified by the visit of Swami Vivekananda, although the details of this visit are, unfortunately, still to be explored. Except for very limited information from other sources, most of what we know about this subject is found in a letter written by Swamiji on July 10, 1893 from Yokohama to Sri Alasinga Perumal of the then Madras, a devotee and sponsor for his trip to the U.S.A. Swamiji also wrote another letter on the same subject from Japan to the Maharaja of Khetri in Rajasthan, another disciple, which has not been traced to date.

Let us now furnish this first-hand information about his visit to Japan from the letter he wrote to Alasinga Perumal. Among other things Swamiji writes: [4]

"... From Canton I returned back to Hong Kong and from thence to Japan. The first port we touched was Nagasaki. We landed for a few hours and drove through the town. What a contrast! The Japanese are one of the cleanliest peoples on earth. Everything is neat and tidy. Their streets are nearly all broad, straight, and regularly paved. Their little houses are cage-like, and their pine-covered evergreen little hills form the background of almost every town and village. The short-statured, fair-skinned, quaintly dressed Japanese, their movements, attitudes, gestures, everything is picturesque. Japan is the land of the picturesque! Almost every house has a garden at the back, very nicely laid out according to Japanese fashion with small shrubs, grass plots, small artificial waters, and small stone bridges."

"From Nagasaki to Kobe. Here I gave up the steamer and took the land-route to Yokohama, with a view to see the interior of Japan."

"I have seen three big cities in the interior - Osaka, a great manufacturing town, Kyoto, the former capital, and Tokyo, the present capital: Tokyo is nearly twice the size of Calcutta with nearly double the population."

"No foreigner is allowed to travel in the interior without a passport."

"The Japanese seem now to have fully awakened themselves to the necessity of the present times. They have now a thoroughly organised army equipped with guns which one of their own officers has invented and is second to none. Then, they are continually increasing their navy. I have seen a tunnel nearly a mile long, bored by a Japanese engineer."

"The match factories are simply a sight to see, and they are bent upon making everything they want in their own country. This is a Japanese line of steamers plying between China and Japan, which shortly intends running between Bombay and Yokohama."

"I saw quite a lot of temples. In every temple there are some Sanskrit mantras written in Old Bengali characters. Only a few of the priests know Sanskrit. But they are an intelligent sect. The modern rage for progress has penetrated even the priesthood. I cannot write what I have in my mind about the Japanese in one short letter. Only I want that numbers of our young men should pay a visit to Japan and China every year. Especially to the Japanese, India is still a dreamland of everything high and good ..."

As mentioned earlier, we have no detail of his travels in Japan. For example: What temples did he visit? Who were the priests he met? Who were the people Swamiji interacted with and what impact had he left upon them?

Swamiji praised Japan and her people not only in the letter quoted above, but on many other occasions in private conversations as well. In his reminiscences Swami Akhandanandaji, one of his brother disciples, mentions a reference to Japan when Swamiji told him that he had liked a painting by a Japanese artist so much that he considered buying it with what money he had for the trip to Chicago and returning home! [5]

Again while conversing with Priyanath Sinha, one of his friends and devotees, in 1901, Swamiji said, "If I can get some unmarried graduates, I may try to send them over to Japan and make arrangements for their technical education there, so that when they come back, they may turn their knowledge to the best account for India. What a good thing that would be."

Question: "Why, Maharaj, is it better for us to go to Japan than to England?" (That was common during those days when India was ruled by England).

Swamiji: "Certainly. In my opinion, if all our rich and educated men once go and see Japan, their eyes will be opened."

Question: "How?"

Swamiji: "There in Japan, you find a fine assimilation of knowledge, and not its indigestion, as we have here. They have taken everything from the Europeans, but they remain Japanese all the same, and have not turned European; while in our country, the terrible mania of becoming Westernized has seized upon us like the plague."

Question: "Maharaj, I have seen some Japanese paintings; one cannot but marvel at their art. Its inspiration seems to be something which is their own and beyond imitation."

Swamiji: "Quite so. They are a great nation because of their art. Don't you see they are Asians, as we are? ... The very soul of the Asian is interwoven with Art. The Asian never uses a thing unless there be art in it. Don't you know that art is, with us, a part of religion?" [6]

In an interview published in Hindu, a Madras newspaper, in February 1897, again the topic of Japan appeared. Here is a report of that interview: [7]

Hindu: "What did you see in Japan, and is there any chance of India following in the progressive steps of Japan?

Swamiji: "None whatever until all the three hundred millions of India combine together as a whole nation. The world has never seen such a patriotic and artistic race as the Japanese, and one special feature about them is this, that while in Europe and elsewhere Art generally goes with dirt, Japanese Art is art plus cleanliness. I would wish that every one of our young men could visit Japan once at least in his lifetime. It is very easy to go there. The Japanese think that everything Hindu is great and believe that India is a holy land. Japanese Buddhism is entirely different from what you see in Ceylon. It is the same as Vedanta. It is positive and theistic Buddhism, not the negative atheistic Buddhism of Ceylon."

Hindu: "What is the key to Japan's sudden greatness?"

Swamiji: "The faith of the Japanese in themselves, and their love for their country. When you have men who are ready to sacrifice their everything for their country, sincere to the backbone - when such men arise, India will become great in every respect. It is the men that make the country! What is there in the country? If you catch the social morality and the political morality of the Japanese, you will be as great as they are. The Japanese are ready to sacrifice everything for their country, and they have become a great people. But you are not; you cannot be, you sacrifice everything only for your own families and possessions."

Hindu: "is it your wish that India should become like Japan?"

Swamiji: "Decidedly not! India should continue to be what she is. How could India ever become like Japan, or any nation for that matter? ... "

It is clear from the above reports of Swamiji's views on Japan that he had a firm belief that it would do good for Indians if they imbibed the positive qualities of the Japanese without abandoning their own national characteristics.

Here we see Swamiji not just in the role of a traditional religious leader, but the mentor of a nation; not only thinking in terms of spiritual regeneration, but also concerned with the material rejuvenation of his country - a nation which had been subjugated and was groaning under the exploitation of British Imperialism.

Another remarkable incident took place while Swamiji was in Japan which later proved to be momentous in the economic and educational history of India - an incident about which very few Indians have any knowledge of even today. While in Japan, Swamiji had met Jamshedji Tata, the founder of a higher institute of scientific research and also of a huge steel factory. Perhaps they first met while staying at Oriental Hotel in Yokohama in the second week of July 1893, and this association continued for around another 10 days; that is, from 14th July through 25th July, on their way to Vancouver, B.C. since they were fellow passengers on the ship called 'The Empress of India'. [8]

Jamshedji was the sole exporter of Japanese made matchsticks to India at the time. It is quite probable that since both men were visionary, dynamic and patriots, they discussed many important things for the uplift of India. But we can only speculate, as again, any details of these conversations are missing. We do know, however, from stories recollected by Mahendranath Datta, Swamiji's younger brother, who had obviously heard it from the latter, that Swamiji had advised Jamshedji that instead of merely eking out a meager profit in his present enterprise with Japan, he should start a match factory in India which would provide employment to many of his countrymen. It would also generate more income for him in the process[9]. Remembering Swamiji's animated discussion with him and later in observing the former's spectacular success in preaching Vedanta in the West, and the rejuvenating effect his message had on the Indian people, upon his triumphant return to India in 1897, Jamshedji wrote a letter to Swamiji dated 23rd November, 1898[10]. In it he requested Swamiji to take a leadership role in materializing his plans for a 'Science Research Institute', an idea that would meet with great difficulty from the British. Although it was not possible for Swamiji to accept such an offer, an editorial was written in the April 1899 issue of Prabuddha Bharata, the English organ of the Ramakrishna Order, highly appreciative of Jamshedji's noble endeavor in all probability at Swamiji's bidding.

There is however another version of what transpired between Swamiji and Jamshedji during the said voyage, given in an address by none other than Dr. Abdul Kalam, the former President of India and a celebrated scientist, at the 'Youth Convention' and inauguration of the 'Vivekananda Institute of Value Education and Culture' at Porbandar, Gujarat on January 12th 2006. It should be noted that the source of Dr. Kalam's information is not known to the present author. The relevant extract from his address is as follows:

"…At this point let me share the meeting between Swami Vivekananda and Jamshedji Nusserwanji Tata during a ship journey. It happened in 1893. A ship was sailing Japan to USA. There were hundreds of people in that ship including two significant personalities. Swami Vivekananda and Jamshedji Tata were in that ship. Swamiji asked Jamshedji for what mission he was traveling. Jamshedji said that he wanted to bring steel industry to India. Swami Vivekananda blessed him. He suggested steel technology had two components – one is steel science and the other is manufacturing technology. What can you bring to this country in material technology – you will have to build material science within the country. Jamshedji was thinking and thinking and made a decision. Earlier when Jamshedji went to London he asked for technology transfer for Steel Plant. UK steel manufacturers looked at Jamshedji and said that if Indians make steel, Britishers will eat it. Jamshedji crossed Atlantic Ocean, talked to Americans and brought manufacturing technology for steel. And Tata Steel was established in Jamshedpur in 1907 posthumously by his able successor.

He seeded and worked for the steel plant. Jamshedji is not there now, but 7 million tones per annum steel is rolling out. The visionary Jamshedji gave one portion of his asset for starting a science institute today known as Indian Institute of Science at Bangalore." (Note: This institute was finally set up in 1905, one year after Jamshedji's passing away.)

Okakura Tenshin

"This institution as envisaged by Swami Vivekananda, has one of the best material science lab., providing the best of research results for development and production of material for various R&D labs and industries. Also Indian Institute of Science is a world class institution in various areas for physics, aerospace technology, knowledge products, bio-science and bio-technology. This is the one institution where convergence of technology like bio-technology, information technology and nano-technology is emerging. The results will have tremendous influence in improving solar cell efficiency and healthcare, particularly drug delivery system. This institution also participated in the research and development of space programmes, defense programmes and also many societal missions."

It is also interesting to note that Jamshedji once mentioned to Sister Nivedita, Swamiji's Irish disciple who went to India and dedicated her life to implementing Swamiji's vision of education for the women of India, that the Japanese people who had come across Swamiji were amazed by seeing the striking similarity between Buddha and him. [11]

The possibility of a second visit to Japan arose when Tenshin Okakura had gone to India to request Swamiji to take part in a religious conference to be organized in Kyoto provided he would agree. Okakura, born into a samurai family in 1862, studied Buddhist scripture with a Buddhist priest and English in an American missionary school. He had a special love for traditional Japanese art and visited Europe and America as a member of the Imperial Art Commission of Japan in 1886. Later, he was appointed the principal of New Art School in Tokyo, but when he was pressured to follow European art styles in this institution he resigned and founded a new institute named the Hall of Fine Arts attended by prospective young artists. [12]

There was some background regarding Okakura's knowledge of Vivekananda that resulted in his request for Swamiji to revisit Japan. Ms. Josephine MacLeod, another of Swamiji's committed American disciples and a resourceful woman of varied interests, had come to Japan in March of 1901 to study Japanese art and took lessons from Okakura. It was MacLeod who actually acquainted Okakura with the greatness of Swamiji's work and his success in the West. MacLeod's dedication and love for Swamiji may have influenced Okakura to make the trip to India to invite Vivekananda for such a conference. Okakura himself became convinced that a visit by Swamiji held the prospect of enhancing the image of Mahayana Buddhism which he professed , and which he had learned that Swamiji, too, held in high regard and, above all, spiritual regeneration of Japan.

Accompanied by a young Japanese man named Hori – who was leading a life of celibacy and wanted to study Sanskrit and English in India – Okakura reached Calcutta in the first week of January 1902 and met Swamiji on January 6, at Belur Math, the recently established headquarters of the Ramakrishna Order situated on the west bank of the river Ganga not far from Calcutta, then the capital of British India. [13] The image of

Swamiji he had formed from the words of Ms. MacLeod was not only corroborated, but strengthened at this encounter. He wrote of his impression of Swamiji in the following letter:

"…Coming to this place recently I have met Swami Vivekananda. He is so great in spirituality and learning that he is beyond comparison. I consider him to be the greatest man of this age. Wherever you go (in India), you will not find anyone who does not love and respect him ... "

"The revered Swami is a very good speaker in English. He is thoroughly conversant with both Eastern and Western learning and has synthesized them. He teaches the Religion of Oneness.

"I would like to take him to Japan along with me when I go back."

Swamiji and his friends gave a reception for Okakura in Calcutta on 12th January. [14] Okakura implored Swamiji to visit and help Japan regenerate spiritually. McLeod also very much wanted Swamiji to accept the invitation which, she felt very keenly, would have a lasting impact on Japan.

At this time, another invitation to visit Japan came to Swamiji from an entirely different quarter, which was official and from none other than the Japanese Emperor Mutsuhito himself. Students of Japanese history know that it was during the tenure of the Emperor Mutsuhito (1867 – 1912) that the epoch-making Meiji restoration took place in 1868 and the process of modernisation started in full-swing in Japan. Manmathanath Ganguli, a disciple of Swamiji, who happened to be present in the Belur Math, when this official invitation came, reminisced thus: [15]

"It was about four in the afternoon, when one day the Japanese Consul (from the Consulate, Calcutta) came to meet the Swami at Belur. He was asked to be seated on one of the benches inside the inner verandah when Swamiji generally received his guests. He was informed of the honorable guest, but he had to wait for some time before the Swami came down. He took a chair near the Consul and the conversation took place through an interpreter.

After the formal greetings, the Consul spoke to the following purport: "Our Mikado (Emperor) is very keen to receive you at Japan. He has sent me to request you to visit Japan as early as may be convenient to you. Japan is eager to hear about Hindu religion from your lips."

Swamiji answered: "In my present state of health, I think it will not be possible for me to visit Japan now."

The Consul said: "Then, may I, with your permission, inform the Mikado that you will go there sometime in the future when your health permits?"

Swamiji said: "it is very doubtful whether this body will ever be fit enough"

At the time, Swamiji was suffering from diabetes. His body was quite emaciated".

Now one wonders ; What was the background of such an invitation from the Japanese emperor? How did the emperor come to know about Swamiji and become keen to invite Swamiji and listen about Hinduism?

Had Okakura any role in this? But Okakura had never given any inkling, anywhere in his correspondence or conversations that he persuaded the Japanese officials to invite Swamiji.

Then, was the Imperial Government of Japan, being informed by its Consul in Calcutta, about the visit of Okakura and his plan to invite Swamiji to Japan for his participation in a parliament of religions to be organised by the Buddhists, was persuaded to invite Swamiji to Japan independent of the invitation of Okakura?

Besides Okakura, there were a few more prominent Japanese, according to our knowledge, who knew about Swamiji and at least had some idea about his spiritual height and magnetic personality. They were the Japanese representatives of Shintoism, (which was then the state religion of Japan) and Buddhism in the World Parliament of Religions held in Chicago in 1893, who witnessed the tremendous impact that Swamiji had left, in the said Parliament. [16]

Moreover, Daisetsu Suzuki, (1870 –1966), a celebrated scholar who wrote a number of books on Zen-Buddhism and Shin, in English and Japanese, mentioned with a note of appreciation, in one of his recorded speeches that he knew Swami Vivekananda during his stay in USA. Now, did one of these persons mentioned above, inform the Emperor about Swamiji and his greatness? These questions would have to remain unanswered till we get new data on this subject.

Swamiji at times, became enthusiastic about these prospective visits to Japan, but the next moment, he vacillated.

Meanwhile, on 27 January 1902 Swamiji took Okakura with him on pilgrimage to Buddhagaya and Varanasi, a journey Okakura enjoyed immensely. During his stay in Varanasi, Okakura also paid a visit to the 'Poor Men's Relief Association', a charitable hospital started by the followers of Swamiji, which later grew as a full-fledged hospital, known as Ramakrishna Mission Home of Service. Okakura recorded the following comment on the visitor-book of the institution on 9th February 1902, along with his signature. "After visiting the institution, I sign my name to express my deepest sympathy and gratitude for the noble work of the Relief Association. May all works be carried on in that spirit". [17]

It was at this time that Sister Nivedita, whom we have already mentioned, introduced Okakura to the great poet Rabindranath, who was already a celebrity in Bengal. Okakura became closer to Rabindranath and other members of the Tagore family, including Surendranath Tagore, a relationship about which many are aware. On the other hand, Okakura's relationship with Swamiji was waning, especially when Swamiji clearly expressed his inability to revisit Japan, considering various practical difficulties including his failing health.

It is true that both men had identical views on various issues for example, the regeneration of Asiatic nations, Mahayana Buddhism and aesthetic concepts, but it was gradually revealed to each other that they had some fundamental differences in their approaches to the highest ideal of life. Further, their level of realising that ideal was also very different. Being himself a realised soul of the highest order, Swamiji's dedication to the spiritual ideal based on renunciation (Nivritti marga – the path of renunciation of desires) was total. But Okakura's way was the path of desire (Pravritti marga) and he still had 'love for the world' which becomes evident if one analyses his personal life prior to his visit to India and after[18]. Moreover, Okakura had a secret political agenda in uniting Asia against European Imperialism, which he did not reveal to Swamiji, who, as a monk, scrupulously distanced himself and his newly established Order from all active politics. Nevertheless, Okakura continued his relationship with Sister Nivedita who edited 'Ideals of the East' (published in London, 1903) and 'The Awakening of the East' (published in Tokyo,1939) written by him.

After spending eventful months in India, Okakura returned to Japan that same year in October, but would not talk much about India upon his return. But there is one special occasion known to us when Okakura urged his audience of 70 Japanese historians to visit India at least once, in an address lasting more than two hours, on the history of Indian Art at the Academy of History, University of Tokyo, on 12 December 1902. [19]

It is also worth mentioning that Swamiji made the following significant remark on 4 July 1902, the last day of his mortal existence, the context of which is not known to us: "I want to do something for Japan."[20] This shows that Japan occupied his thoughts even to the end. Presumably, Swamiji's wish was fulfilled partially, when a Vedanta Society, (now located in Zushi), was started in Japan in 1959 by a group of devotees, and later affiliated to the Ramakrishna Mission, as one of its accredited branches in 1984.

The information furnished above shows that in promoting the Indo-Japanese relationship, especially in the modern era, while Okakura Tenshin was a pioneer on the Japanese side, Swami Vivekananda was the preeminent Indian pioneer. This relationship was strengthened by later visits and stays of other prominent Indians, namely the poet Rabindranath Tagore, the freedom fighters, Rashbihari Basu and Netaji Subhas Chandra Basu, and the jurist Radhabinod Pal.

It is a pity that though many people in both India and Japan are aware of the Tagore-Okakura connection and the visit of Tagore to Japan, few indeed know the Vivekananda-Okakura connection or anything related to Swamiji's visit to Japan. In this backdrop it is heartening to observe that possibly for the first time a contemporary Japanese government official has recognized the pioneering role of Swami Vivekananda when former Prime Minister Shinzo Abe made the following respectful and appreciative references to Swamiji during that very important policy speech on Indo-Japan relations, on 22nd August, 2007, before the Joint Session of the Indian Parliament during his recent visit to India. The references made by Prime Minister Abe are as follows:[21]

"**Today I have the great honour of addressing the highest organ of state power in this largest democracy in the world. I come before you on behalf of the citizens of another democracy that is equally representing Asia, to speak to you about my views on the future of Japan and India.**

""The different streams, having their sources in different places, all mingle their waters in the sea.' It gives me tremendous pleasure to be able to begin my address today with the words of Swami Vivekananda, the great spiritual leader that India gave the world."

"A number of times in history, Japan and India have attracted one another. Vivekananda came to be acquainted with Tenshin Okakura, a man ahead of his time in early modern Japan and a type of Renaissance man. Okakura was then guided by Vivekananda and enjoyed also a friendship with Sister Nivedita, Vivekananda's loyal disciple and a distinguished female social reformer ... "

"I would argue that among many contributions that India can make to world history, there is first of all its spirit of tolerance. I would like to quote, if I may, Vivekananda again, part of the conclusion of deeply meaningful remarks he delivered in Chicago in 1893. He said, 'help and not fight,' 'assimilation and not destruction,' 'harmony and peace and not dissension.' "

"If you insert these exhortations into the context of the modern day, it is clear that these words preaching tolerance can hardly be considered relics of the past. Instead, we can recognize that they now hold a tone that is even more compelling than before."

We may conclude this article with this observation that if we were to analyse the trend of Indo-Japanese relationship in recent years, it would be evident that what Swamiji had hoped with regard to the outcome of the said relationship about a century ago, is now actually taking place. While Japan has been largely contributing to the material welfare of India, by lending both financial and technical assistance, India is also lending spiritual support to many people of Japan. People of

all ages visit the branches of Indian religious organisations in Japan, including the Vedanta Society, take part in their different programmes, throng in hundreds when any Indian religious leader visits Japan, and also go to different ashrams and holy places in India to seek peace and spiritual guidance. This is in addition to the elderly Buddhist devotees, who usually go to India, on pilgrimage for visiting places associated with Lord Buddha.

Indo-Japanese relationship is not restricted to the economic and spiritual areas only, but also extends to the cultural sectors – especially, the traditional health-care system and performing arts.

Nevertheless, this relationship ought not to focus only upon these two countries, but the ultimate perspective must be global. Let us all combine our hands in promoting the Indo-Japanese relations, at all levels, and in all sectors, with the ultimate aim that a fully developed India and Japan would contribute in making, what we may call, a fully developed world, which was the vision of great minds like Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore.

Notes and References:

1. The Life of Swami Vivekananda – His Eastern and Western disciples.vol.1.P.391, 5th edition, 1979, Advaita Ashram. Calcutta–14.

2. World thinkers on Ramakrishna Vivekananda ed. Swami Lokeswarananda. 1983, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta – 29.

3. Ibid.

4. The Complete Works of Swami Vivekananda. Mayavati Memorial Edition.vol.V pp.7-10. 1992. Advaita Ashrama. Calcutta – 9.

5. Swami Akhandananake Jerup Dekhiachhi (Beng) (Swami Akhandananda as we have seen him) – compiled by Swami Chetanananda. Pp.84-85 1999. Udbodhan., Calcutta – 3.

6. Opus Cit., The Complete Works.vol.V.pp.372-73.

7. Ibid.pp.209-210.

8. Swami Vivekananda's Arrival in Vancouver – Historical Research Committee, Centenary of Swami Vivekananda's arrival to the West. P.2.Vivekananda Vedanta Society of British Columbia, Vancouver.1993.

9. Srimat Vivekananda Swamijir Jivaner Ghatanavali (Incidents in the life of Swami Vivekananda) – Mahendranath Datta.vol.3.pp 2-3. Mahendra Publishing Committee.1989.Calcutta – 6.

10. Vivekananda O Samakalin Bharatvarsha (in Beng) (Vivekananda and Contemporary India in seven volumes) – Sankariprasad Basu.vol.V.chapter 32. pp 239-266).September 1981. Mandal Book House. Calcutta – 9;

    A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda – Sailendranath Dhar. Vol.2. pp 1117-1118 Vivekananda Kendra Prakashan 1975. Madras – 5.

11. Opus Cit., Vivekananda O Samakalin Bharatvarsha p.240.

12. Ibid. Vivekananda-Okakura, Chapter 38. pp. 458 - 470 ; Okakura and Swami Vivekananda-Yasuko Horioka. Prabuddha Bharata (monthly) January 1975 and March 1975 – Advaita Ashrama, Mayavati.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Reminiscences of Swami Vivekananda – Eastern and Western admirers. P.357. Advaita Ashrama.1961.Calcutta – 6.

16. Swami Vivekananda in the West – New Discoveries – Marie Louise Burke (in 6 volumes) – Vol.1. p.77 – p.122. 4th edition 1992. Advaita Ashrama. Calcutta – 14.

17. Memoir: Ramakrishna Mission Home of Service, Varanasi.p.73-published by the Secretary, Varanasi – 2005.

18. Opus Cit., Vivekananda – Okakura, Vivekananda O Samakalin Bharatvarsha. Chapter 38 pp 458-470; Okakura & Swami Vivekananda- Yasuko Horioka : Prabuddha Bharata, January 1975.

19. Opus Cit., Okakura and Swami Vivekananda - Yasuko Horioka – p.142.

20. Opus Cit., The Life of Swami Vivekananda:Volume2.

21. "Confluence of the Two Seas" - Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India. http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

'জাপান যাত্রী' কে ফিরে দেখা

ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

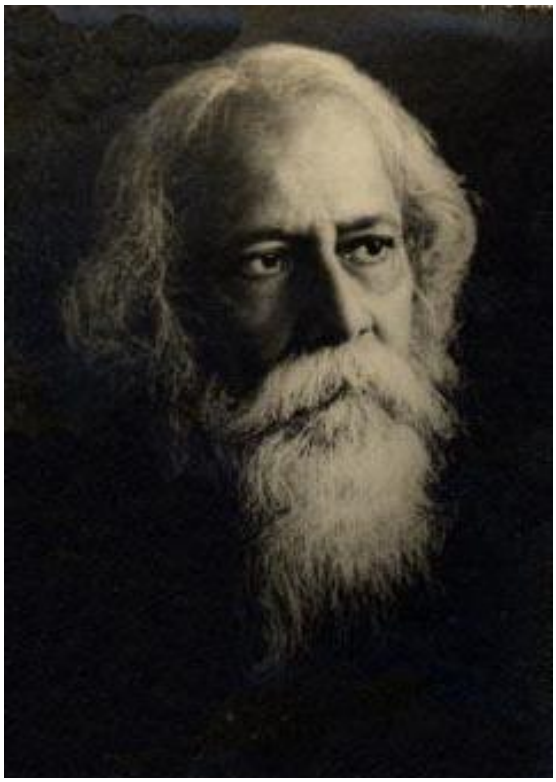

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাপান যাত্রী ' বইটি জাপান ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের এক সেতুবন্ধন। এই বইটি বাংলাভাষার বিমুগ্ধ পাঠক পাঠিকাকে আনন্দ দিচ্ছে প্রায় ৯১ বছর ধরে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তার গভীরতা, অনুবীক্ষণের ক্ষমতা এবং অভিব্যক্তি আমাদের বিস্মিত করে বারবার। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বইটির প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু আজও সেই একই। লেখাগুলি ১৯১৬ সালের যখন উনি প্রথমবার জাপানে আসেন এবং এগুলি গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। এর পরেও আরও দুবার বিশ্বকবি জাপানে আসেন ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে। বইটি তো কেবলমাত্র ভ্রমণ কাহিনী বা বিবরণ নয়, এর সাথে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনের আকুলতা, দেশের ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ এবং তাঁর একান্ত আবেদন প্রতিটি বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের কাছে - যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করার জন্য। ভারতবর্ষে থেকে বইটিকে যতটা উপলব্ধি করা যায়, জাপানে আসলে বা জাপানকে দেখলে তা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ হয় এটি আমার অভিজ্ঞতা। এখানে আমি বইটির মূল্যবান কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি যেগুলো আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছে।

জাপানের সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেই প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলছেন -

"সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ। এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি তখন অনেকের কাছেই শুনেছি যে 'এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি । অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী এই- যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারা অমিতশক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম। ' শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য ঔদাসীন্য উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল!" (পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮)

আজ ৯১ বছর পরেও অনেক সময়ই রাস্তাঘাটে এমন বহু জাপানীর সাথে আলাপ হয়েছে যাঁরা আমি ভারতীয় শুনে 'কামিসামার দেশের লোক' বলে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করেছে। আর আমি লজ্জিত বোধ করেছি এই ভেবে যে বুদ্ধদেব আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃত বৌদ্ধ রীতিনীতি জাপানে বিদ্যমান; ভারতে তার প্রায় কোনও চিহ্নই

নেই- সেটা যে কতটা দুঃখের তা হয়তো আমার মত অনেক জাপানবাসী ভারতীয়ই অনুভব করেন।

আরও একটি অংশে প্রকৃত সৌন্দর্যের বর্ণনায় লিখেছেন,
"জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেইজন্য এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না।" (পৃষ্ঠা -৯১)
উদ্ধৃত অংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ অত্যন্ত গভীর। কোনোকিছুর সুন্দরতা তখনই একটি বিশেষরূপে মানুষের মনকে আকর্ষণ করে যখন তাতে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না। যেখানে মন ও হৃদয় একসাথে জুড়ে আত্মসমর্পিত হয় বা নিজেকে উজাড় করে দেওয়া হয় তার মধ্যে যে সৌন্দর্য বিকশিত হয় তা কি আর কিছুতে থাকে?

রবীন্দ্রনাথ ভারত ও জাপানের মধ্যে মিল খুঁজে পান সৌন্দর্যের দার্শনিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। একটি জাপানী হাইকুর উল্লেখ করে তিনি বলেন,
"স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল-
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।
আমার মনে হয় এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্তকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ - মানুষের হৃদয় যদি না থাকতো তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত - এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।" (পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬)

আসল সৌন্দর্য অন্তরের, সেটা বাহ্যিক নয়, এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য চিরস্থায়ী হয় না। এই গভীর অর্থকে বুঝতে গিয়ে আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের একটি গানের কথা মনে আসে -
' ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে
দেবতা ওগো তোমার সেবা আমার তরে। '
বিনয়, সহিষ্ণুতা ও আত্মনিবেদন তিনটির সমন্বয়ে যে সৌন্দর্য, তারই প্রকাশকে তিনি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আসলে ১৯১৬ সালে লেখা হলেও এই সৌন্দর্য আজও জাপানে দৃশ্যমান। কিন্তু আমার গ্রহণশীলতা যদি না থাকে, তাহলে এই দেখা শুধু চোখের দেখা হয়েই থেকে যাবে- তার প্রকৃত অর্থ আমার অন্তরে পৌঁছবে না।

জাপানের কাছ থেকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার শিক্ষণীয় দিকের প্রতি উল্লেখ করে কবিগুরু বলেন, ' আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। ' (পৃষ্ঠা ৯২-৯৩)

আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন এই বইটি ও আরও কয়েকটি বই পড়ে জাপানের একটি মানসচিত্র এঁকেছিলাম; জাপানে আসার পর ও এখানে একটানা ছয় বছর থাকার পর একটি প্রশ্ন আমাকে তাড়িত করে - আমি কতটা তাঁর লেখা থেকে গ্রহণ করেছি বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে তাকে স্থান দিয়েছি?

প্রতিদিনের অত্যন্ত সাধারণ একটি দৃশ্য এখানে সকলের পরিচিত - ট্রেনে, বাসে, দোকানে, উৎসবে বা পথে ঘাটে সর্বত্র লাইনে এগিয়ে যাওয়া। কেউ এই লাইন ভাঙ্গার চেষ্টা করে না যতই তাড়া থাকুক না কেন। ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে চলে বলে এদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সহজ ও সুন্দর হয়েছে। আর একটা আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা হোল সততা - কাজের ক্ষেত্রে, দেশের ক্ষেত্রে ও সমাজের ক্ষেত্রে - তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক হোক। আমি এখানে আসার পর প্রথম বছরেই একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে বর্ষার আগে বা 'টাইফুন' আসার আগেই এরা সমস্ত বিদ্যুৎবাহী তার (ইলেকট্রিক লাইন) সংস্কারের কাজ করে এবং যারা সেইসময় কাজ করছিল তারা সদ্য স্কুল পাশ করা ১৭-১৮ বছর বয়েসী ছেলের দল। একের পর এক লাইন ধরে ধরে কাজ করে চলেছে, কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে হয়তো দু'চারটে কথাও বলছে, কিন্তু কাজে কোনও ফাঁকি নেই। আমি প্রথমত: দেখে বিশ্বাসই করতে পারি নি যে এদের সাথে কোনও সুপারভাইজার নেই; সদ্য ভারত থেকে আসা মনে সেটি অবিশ্বাস্য। যখন জানলাম যে এরা কেউই কাজকে অবহেলা করবে না - কাজ এদের কাছে পূজা (work is worship যা আমরাও ছোটবেলায় শুনেছি) তখন আমার নিজের দেশ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো - আমাদের দেশে এই ইলেকট্রিক লাইনের তার ঝুলে থাকায় দুর্ঘটনা ও মৃত্যু প্রায়ই ঘটছে - তা আমরা সকলেই জানি।

শুরুতেই আরও একটি ঘটনা মনকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রতিদিন সকালে রাস্তাঘাটে শিশুরা দল বেঁধে নিশ্চিন্ত মনে স্কুলে যাচ্ছে। ৫-৬ বছরের শিশুরা ট্রেনে বা বাসে একা নিশ্চিন্তে যাতায়াত করছে - এদৃশ্য নিয়মিত দেখা যায়। কোথাও কোথাও চৌরাস্তার মোড়ে কোনও অভিভাবক হলুদ রঙ্গের পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের কাজ হল বাচ্চাদের বড় রাস্তা পার করিয়ে দেওয়া। যাঁরা সকালে পথে বেরোন তাঁরা নিশ্চই এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এই সামাজিক ব্যবস্থাগুলি দেখলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কেন উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন। আমি এও জানি যে একসময় ভারতেও এগুলি ছিল। কেন হারিয়ে গেল সেটা না খুঁজে বরং কিভাবে এগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় সে সম্বন্ধে সচেতনতা প্রয়োজন।

জাপানীদের পরিমিতি বোধের প্রশংসা করে কবিগুরু লিখেছেন, " জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। ' (পৃষ্ঠা ৮৫)

এটি আরেকটি অসাধারণ ক্ষমতা জাপানীদের - পরিমিতি বোধ বা মাপের জ্ঞান। কথা বলা, ঘর সাজানো ও ব্যবহার সর্বত্রই এই পরিমিতি বোধ দেখতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কিছু হবার উপায় নেই। ফুল সাজানো, আসবাবপত্র সবেই এটা চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে একসময় এই রিক্ততার স্থান ছিল এবং একে সামাজিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া হোত। রিক্ততার অর্থ এখানে একটু অন্যরকম - নিজেকে বিকাশ করার জন্য বেশ কিছু জায়গা খালি রাখা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায়, গানে, কবিতায় সবের মধ্যেই মানসিক উত্তরণের কথা বলেছেন যা সংসারে থেকে সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে রেখেও করা সম্ভব বলেই ওনার বিশ্বাস ছিল - 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ ' -মুক্তি (নৈবেদ্য- সঞ্চয়িতা) আসলে এই পরিমিতিবোধের একটি সুফল হোল অহেতুক অপ্রয়োজনীয় মনোমালিন্য, বিবাদকলহ ও হিংসা দ্বেষ থেকে দূরে থাকা যায়। জীবনযাত্রায় এই পরিমিতিবোধকে কাজে লাগাতে পারলে একে অন্যের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না - সম্পর্কের মাধুর্য বজায় থাকে। প্রতিদিনের ছোটখাট অসুবিধা বা আচরণ হয়তো আমাদের মত অনেককেই পীড়া দেয়। কিন্তু সেগুলি থেকে মুক্তির উপায় আমরা ভাবার চেষ্টা করি না। হয়তো এটি আপাতদৃষ্টিতে দর্শনতত্ত্ব বা ভারী কথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা সকলেই জানি এবং আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মানুষের কোনও না কোনও দিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এবং সেই দিকটিকে নিয়ে চর্চা করলে আমরা দক্ষতা অর্জন করতে পারি। অথচ আমরা সেটিকে বাদ দিয়ে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কাজেকর্মে নিজেদের সময়, মন ও শক্তি খরচ করি। ফলে কোনও ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এবং বহু মনীষী বারবারই সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশে অগণিত এরকম মনীষীর জন্ম হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের কথাগুলিকে নিয়ে কখনই ভাবার চেষ্টা করিনা। জাপানযাত্রী বইটি পড়তে গেলে মাঝে মাঝে এটিকে দর্শন শাস্ত্র বা জীবন দর্শন বলে আমার মনে হয়। প্রতিটি সমাজ, জাতি এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যা ভাল তা সর্বকালে সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য - এই কথাটিকে বারবার এই বইয়ে নানান উদাহরণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। স্বাভাবিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ততা ও রিক্ততা দুটির সংমিশ্রণ চাই। আড়ম্বর এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জাপানযাত্রীর পরিশিষ্টে (১১১ পৃষ্ঠায়) ধ্যানী জাপান নামে একটি প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ জাপানে ধ্যানের রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনের প্রতিটি কাজে ধ্যান ও একাগ্রতার ফলেই জাপানীরা নিজেদের জীবনকে ও সমাজকে সংযত করতে শিখেছে- এটি মূল কথা।

'একদা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ধ্যানের প্রচার হয়েছিল। দেবপূজার সঙ্গে এই ধ্যানের যোগ নেই; মনকে স্তব্ধ করা, অবহিত করা, ধৈর্য ও বুদ্ধিশক্তিকে দৃঢ় করার পক্ষে ধ্যানের উপযোগিতা সেখানে সকলে স্বীকার করে। সাধারণত জীবনযাত্রায় নৈপুণ্য ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্যে ধ্যান একটা প্রধান উপায় একথা সাধারণ লোকেও বোঝে '।

এই অংশটি পড়লে মহাভারতের পান্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের গল্প মনে হয়। এই একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ আশ্রমে শেখানো হোত এবং অর্জুন তাকে সম্পুর্ণ ভাবে আয়ত্ব করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়লেও আমরা এই ধ্যান ও একাগ্রতার গল্প জানতে পারি। যুগের সাথে সাথে আমাদের জীবনযাত্রা ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, তাতে অনেক জটিলতাও যুক্ত হয়েছে। এই অবস্থায় বিশেষ কোনও কাজে যখন মনঃসংযোগ ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, তখনই বুঝি ধ্যানশিক্ষা কত জরুরী। এর প্রয়োজনীয়তা দিনকে দিন বাড়ছে। এইরকম ছোটখাটো ঘটনাকে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করার চেষ্ঠা করেছেন। বইটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে এটিকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে। জাপান ভারত মৈত্রী বর্ষে জাপানকে আরো ভালো করে জানা এবং জাপানের কাছ থেকে আমাদের যা কিছু শিক্ষণীয় আছে তা গ্রহণ করবার ব্যাপারে আমরা যদি প্রয়াসী হই, তাহলে ' জাপান যাত্রীকে ' ফিরে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাপানযাত্রীর এক বিমুগ্ধ পাঠক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আমরা যদি এই বইয়ের কিছু কথাকে আমাদের নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আগামীদিনের সমাজ এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হবে এবং আমরাও সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করবো।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রবিদ নাকামুরা হাজিমে

কল্যাণ দাশগুপ্ত

নাকামুরা হাজিমে (২৮শে নভেম্বর, ১৯১২-১০ই অক্টোবর, ১৯৯৯) নামটির সঙ্গে আমার পরিচয় স্বদেশে। কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত যে জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরটির খবর পাঠক পাঠিকাদের অনেকেই সম্ভবত রাখেন, সেখানেই প্রথম জনৈক বৌদ্ধ পুরোহিতের মুখে ভারতবন্ধু এই জ্ঞানান্বেষীর নাম শুনি। আরও জানতে পারি, নাকামুরা নাকি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে পারঙ্গম। আজীবন ভারতচর্চায় আত্মনিয়োজিত এই মানুষটির সঙ্গে টোকিয়ো শহরে বসবাসকালীন মুখোমুখি হতে পেরেছি বার দুই মাত্র, দু-বারই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসগৃহে। সেখানে কথার আদানপ্রদান সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোকিয়ো শহরে প্রতি বছর নাকমুরা প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সংসদ কর্তৃক যে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এক-আধ সময়ে দূর থেকে ওঁকে যা দেখতে পেয়েছি, আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যতদূর খবর পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে নাকামুরা হাজিমের প্রামাণ্য কোনও জীবনী এখনও রচিত হয়নি। তদ্‌সত্ত্বেও নীচে ওঁর সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পরিবেশন করতে সাহসী হচ্ছি, তার জন্য উপাদান জুগিয়েছে সানসেইদো প্রকাশনালয়ের জাপানি চরিত্রাভিধান এবং উইকিপেডিয়া তথা গুগ্‌লের জাপানী সংস্করণ। স্বীকার করে নিচ্ছি, গ্রন্থাদির বাংলা নাম আমারই অক্ষম অনুবাদ।

নাকামুরা জন্মেছিলেন শিমানে প্রদেশের মাৎসুএ শহরে বসবাসকারী একটি সাধারণ পরিবারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে প্রবেশ করেন হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে। ১৯৪১-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করে তিনি আর এক মহাজ্ঞানী বৌদ্ধদর্শনবিদ্ উই হাকুজুর নির্দেশাধীনে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন চর্চায় ব্যাপৃত হন। সেই সঙ্গে অধ্যাপক কাজু. চি তেৎসুরোর স্নেহচ্ছায়ায় পাঠ নেন নীতিবিজ্ঞানের।

প্রসঙ্গত আরও একটু যে তথ্যটির দিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লোভ হচ্ছে, তা হল এই যে ঠিক এ সময়েই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে মহাযুদ্ধের আগুন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন টোকিয়োরই অধিবাসী। সম্প্রতি নাকামুরা তাকেশি রচিত রাসবিহারী বসুকে নিয়ে লেখা যে বইটি (নাকামুরায়ানো বোসু) পুরস্কৃত হয়েছে, তাতে নাকামুরা হাজিমের উল্লেখ পাচ্ছিনা। আরও জানিনা, এর পরের দুবছরের মধ্যে কলকাতা শহরে অকারণ দুর্ভিক্ষে দশ লক্ষাধিক অনাহারী গ্রামবাসীর মৃত্যুকাহিনী তদানীন্তন জাপানে এসে পৌঁছেছিল কিনা। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এই বিধ্বংসী যুদ্ধেরই আবহে ভারত তত্ত্ববিদ্ নাকামুরা হাজিমে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন দুরূহ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত নাকামুরা হাজিমে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে ১৯৭০- এ স্থাপিত হল তাঁর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা পরিষদ (তোওহোও-কেনকিউকাই)। এছাড়া নাকামুরা ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রিক অন্যান্য বহু সংস্থার জনক। জাপান-ভারত সংস্কৃতি সংস্থার তিনি ছিলেন কর্ণধার। ১৯৭৪-এ অগ্রণী হয়ে তিনি স্থাপন করেন তুলনামূলক চিন্তাধারা গবেষণা মন্ডলী, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা। বিদ্যাচর্চার এই একটি শাখায় তাঁকে সারা পৃথিবীতেই পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়।

টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর নাকামুরা হাজিমের কাছে জাপানের অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনার অনুরোধ আসে। কিন্তু নাকামুরা এসব অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। তার বদলে টোকিয়োর কান্দা অঞ্চলে স্থাপন করেন প্রাচ্যবিদ্যানিকেতন (তোওহোও-গাকুইন), যার অর্গল মুক্ত ছিল শিক্ষার্থীমাত্রেরই কাছে, যেখানে কে কোন দেশের নাগরিক, কার কত বয়েস অথবা শিক্ষাগত কি যোগ্যতা, সে-প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হত না। নাকামুরা এটির উল্লেখ করতেন 'তেরাগোয়া' (বাংলা অনুবাদে পাঠশালার কাছাকাছি) আখ্যায়। অধ্যাপনার বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা মূর্ত হয়েছিল এই বিদ্যানিকেতনে। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ভবিষ্যতেও চালু থাকলে যথার্থ বিদ্যাচর্চার সম্ভাবনা নেই।

৮৬ বছর বয়সেও লাঠিতে ভর করে সপ্তাহে একদিন নাকামুরা তাঁর তেরাগোয়ায় পড়াতে যেতেন। তাঁর এই প্রাচ্যবিদ্যানিকেতনের আদর্শ সারা জাপানে ছড়িয়ে পড়েছিল, পরবর্তীদের প্রচেষ্টায় অতঃপর ওসাকা, নাগোয়া ইত্যাদি শহরেও অনুরূপ বিদ্যানিকেতন স্থাপিত হয়। মৃত্যুর বছর খানেক আগে অবধি NHK-র শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে নাকামুরা অংশ নিয়েছেন। এ অনুষ্ঠানে নাকামুরা হাজিমে শ্রোতাদের বোঝাতে চাইতেন, বৌদ্ধধর্ম বই পড়ে শেখার বিদ্যা নয়, বুদ্ধের বাণীকে নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহই কর্তব্য।

ভারতীয় দর্শনের বিশেষ করে যে শাখাটিকে কেন্দ্র করে নাকামুরা হাজিমের জ্ঞানান্বেষণ, তা হল বেদান্ত। ১৯৫৭-য় তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের বেদান্ত-ইতিহাস জাপান অ্যাকাডেমি (গাকুশিইন)-র পুরস্কার পায়। তারপর UNESCO-র তৎপরতায় ইংরিজিতে অনুবাদ হয় তাঁর প্রাচ্য চিন্তাধারা নামে গ্রন্থটি। ১৯৭৭-এ জাপানের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মান সূচক পদক লাভ করেন নাকামুরা হাজিমে। জাপান সরকার তাঁকে প্রথম পংক্তির সাংস্কৃতিক সম্মানেও (কুন্ ইত্তো জু ইহোশো) ভূষিত করে।

সারা জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, মূল সংস্কৃত ও পালি থেকে অনুবাদও যার অন্তর্গত। শুধুমাত্র ভারতীয় চিন্তাধারাই নয়, জাপানি, কোরিয়, তিব্বতি চিন্তাধারা সম্পর্কেও তাঁর লেখা আছে। এছাড়া আছে তিন খন্ডে ভারতের উপর লেখা ইতিহাস গ্রন্থ। জৈন ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁর রচনা ' চিন্তার স্বাধীনতা ও জৈন ধর্ম '। এছাড়া সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা ইত্যাদি নিয়েও তাঁর লেখা আছে। আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারা বিষয়ক গ্রন্থও তাঁর অন্যতম রচনা।

নাকামুরা হাজিমে জাপান ছাড়াও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর জীবনকালে তিনি সর্ব পৃথিবীতেই সর্বোচ্চস্থানীয় বৌদ্ধদর্শনবিদ্ রূপে পরিচিত ছিলেন।

আইজাক নিউটনের অনুপস্থিতিতে তাঁর পোষা কুকুরটি টেবিলে উঠে মোমবাতি উলটে দিয়েছিল বলে শোনা যায়। বৈজ্ঞানিকের অমূল্য কিছু পান্ডুলিপি তাতে ভস্মীভূত হয়। নিউটন নাকি ব্যাপারটা অবগত হয়ে শুধুমাত্র উক্তি করেছিলেন, হায়রে কুকুরটা জানেনা সে কি করেছে।

নাকামুরা হাজিমে সম্পর্কে এ লেখার পরিশেষে অনুরূপ একটি বহুজ্ঞাত কাহিনী নিবেদন করতে চাই। নাকামুরা যখন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, তখনই তিনি মূলত একক প্রচেষ্টায় তিন খন্ডে তাঁর ৪৫,০০০ শব্দ সম্বলিত (পরে আরও ৮০০০ শব্দ এতে সংযোজিত হয়) বৌদ্ধ ধর্মীয় পরিভাষাকোশ সংকলন করেছিলেন। এটির পান্ডুলিপি প্রকাশকের অনবধানতায় হারিয়ে যায়। ঘটনাটি নাকামুরার কানে গেলে তিনি ক্রোধ বা বিরক্তি তো দূরের কথা, সামান্য অসন্তোষও প্রকাশ না করে আবার প্রথম থেকে লেখা সুরু করে আরও আট বছরের পরিশ্রমে কাজটি শেষ করেন।

ভারতপ্রেমী মানুষ নাকামুরা হাজিমের এই ছিল পরিচয়।

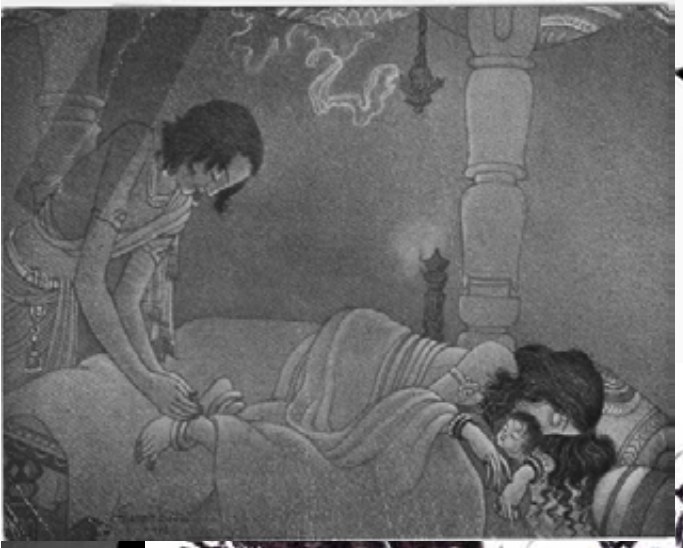

নাওকি নিশিওকা

インドの風・日本の風
Kokubo Subha Chakraborty
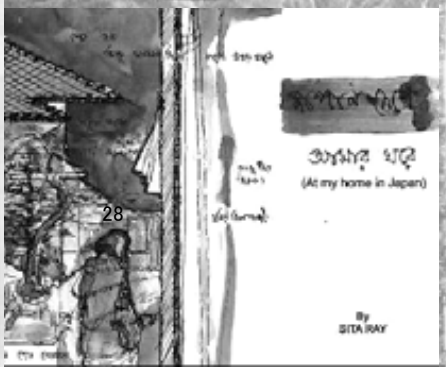
(At my home in Japan)
By
SITA RAY
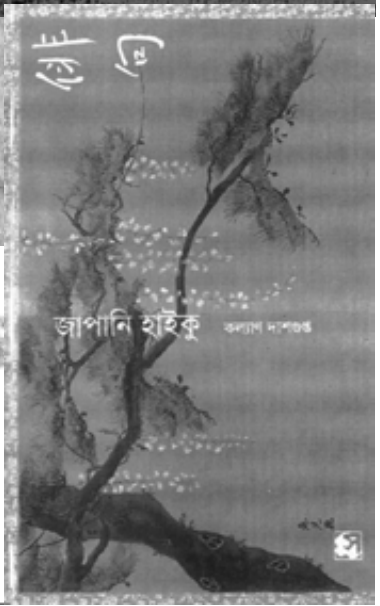
জাপানি হাইকু

স্বপ্ননীল আকাশ

মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

সাজগোজ শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে শেষবারের মতন খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল মল্লিকা। না সুন্দরী তাকে বলা যায় না। বিশেষ করে বাঙালীর সৌন্দর্য বিচারে। কারণ সে বেশ কালো। কাজেই সৌন্দর্য বিচারের প্রথম ধোপেই সে টেঁকেনা। কিন্তু আলগা একটা শান্তশ্রী সারা চেহারা ঘিরে থাকাতে তার দিকে চোখ পড়তে বাধ্য। আর একবার চোখ পড়লে তা ফিরিয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় চলে যাবেই। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ। তার উপর ছোটবেলা থেকে নাচ, যোগব্যায়াম করে নিজের চেহারা খানা অটুট রেখেছে। সদ্য চল্লিশ পেরিয়েও তাকে অনায়াসে তন্বী বলে চালানো যায়। সে কারণে একটু গর্বিতও যেন। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে একটা সন্তুষ্টির স্মিত হাসি ফুটে উঠল মুখে। নাঃ খুব একটা বদল হয়নি চেহারার। মেয়ের সঙ্গে বেরোলে এই সেদিনও লোকেরা দুই বোন বলে ভুল করেছে। মেয়ের কথা মনে পড়তে আনমনা হয়ে যায় সে। একটা মাত্র মেয়ে তার। বড় অল্প বয়সে বিয়ে দিতে হোল। সবেমাত্র আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছিল। অথচ এত ভাল আর অযাচিত সম্বন্ধটা ওরা ছেড়েও দিতে পারেনি। মেয়ের তো প্রচন্ড আপত্তি। তাই দেখে মল্লিকা একটু মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল বয়সের কথা তুলে। কিন্তু রূপক তা কানেই তোলেনি। এক কথায় তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিল, ' পাগল নাকি! এত ভাল সম্বন্ধ কেউ ছেড়ে দেয়? তাও আবার যেচে আসা! তা, তোমারও তো অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল, তাহলে এত আপত্তি কিসের?' মল্লিকা ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেয়, ' হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু তা বলে এত অল্প বয়সে তো নয়? তাছাড়া তিন্নি আরও পড়তে চাইছিল। ওর কত স্বপ্ন'! তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রূপক বলে ওঠে, ' তা পড়ুক না কত পড়বে। বিয়ের পরে কি আর পড়া যায় না? যায় যে তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। পড়াশোনার ব্যাপারে পাত্রপক্ষের কোনও আপত্তি নেই। ওঁদের সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়ে গেছে। শুধু তাই না, নাচ গানেও আপত্তি নেই। ওঁদের ছেলে শাশ্বত তিন্নিকে কোথায় জানি নাচতে দেখে মুগ্ধ। বুঝলে তো? এবার যাও বিয়ের জোগাড় করো গে '!

মল্লিকা আর কিছু বলতে পারে নি। বয়সের জন্য তার যত না আপত্তি, তার চেয়েও বেশী আপত্তি ছিল মেয়েকে দূর দেশে পাঠাতে। বিয়ের পরেই ওরা সুইট্জারল্যান্ডে চলে যাবে। আর কি ফিরে আসবে? বিদেশে গেলে আজকাল আর কেউ ফিরে আসে না। ইচ্ছা করলেও তো মেয়েটাকে একটু চোখের দেখাও দেখতে পাবেনা। দেশের মধ্যে থাকলে তবু যা একটু সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কি আর করা। মায়ের মনের ব্যথা কে আর কবে বুঝেছে? মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শেষপর্যন্ত চুপ করে গেছে সে। তবে তার জামাই শাশ্বত বড় ভাল ছেলে। একেবারে ঘরের ছেলের মতনই। মেয়েটা সুখী হয়েছে এই যা সান্ত্বনা। প্রায় রোজই ফোনে কথা হয়। মেয়েটার ছেলেমানুষি ভাবটা কাটেনি এখনও। ফোনের মধ্যেই যত রাগ-অভিমান। ওরা ওর কাছে যাচ্ছে না বলে কান্নাকাটি।

কতক্ষণ মেয়ের চিন্তায় বিভোর ছিল মল্লিকা জানে না। দেওয়াল ঘড়ির বাজনায় তার চমক ভাঙলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার তৎপর হয়ে উঠল। আজ অনেকদিন পরে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। সকাল থেকে মনটা তাই চনমনে হয়ে ছিল। মাঝখান থেকে তিন্নির কথা মনে পড়ে উৎসাহটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। হাতে বেশী সময় নেই। গাঝাড়া দিয়ে সব ভাবনা দূরে ঠেলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। এক্ষুণি মধুশ্রী এসে পড়বে গাড়ী নিয়ে তাকে নিতে। মধুশ্রী তার ছোটবেলার বন্ধু। এক পাড়ার মেয়ে তারা। তাদের জন্মের আগে থেকে মায়েদের মধ্যে সখ্যতা। স্কুল, কলেজ,

বিশ্ববিদ্যালয় সব একসঙ্গে। মধুশ্রী তাই তার শুধু বন্ধুই নয়, তার থেকেও বেশী আপন বোনের মতন। সাংসারিক কারণে মল্লিকার কলকাতায় বেশী আসা না হলেও মধুশ্রী বেশ কয়েকবার তার কাছে ব্যাঙ্গালোরে ঘুরে এসেছে। রূপকের সঙ্গেও তার শালী-ভগ্নিপতীর মতনই সম্পর্ক। মল্লিকার শ্বশুরবাড়ীতেও সকলে মধুশ্রীকে পছন্দ করেন। গেলে পরে খুশী হন। মল্লিকার মা-বাবা থাকতে ওঁদের জন্যেও মধুশ্রী অনেক করেছে। শানু-লাবনী যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে তাদের বদলে সব কাজ মধুশ্রীই করেছে, তা ডাক্তারের কাছে যাতায়াতই হোক, ওষুধ আনা হোক, বা ডাক্তারের রিপোর্ট আনা হোক। মা বাবাও ওর কাছে সহজ বোধ করতেন অনেক বেশী। মল্লিকার কাজগুলি হাসিমুখে সব সে করেছে। মা তাই বলতেন, 'আমার দুটো মেয়ে - মল্লি আর শ্রী'।
মধুশ্রী বড় সহজে সকলকে আপন করে নিতে পারে।

মধুশ্রী ছাড়া আর মাত্র কয়েকজনের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে চিঠিতে আর টেলিফোনে। অথচ মল্লিকা ভাবতেই পারেনা কি করে সে বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া এত বছর কাটিয়ে দিল। ব্যাঙ্গালোরে অবশ্যই সে অনেক ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু তার সঙ্গে কি ছোটবেলার বন্ধুদের তুলনা হয়? স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবখানেই সে ছিল সক্রিয় আর জনপ্রিয়।

তা সে ডিবেট হোক, ইউনিয়ন হোক, বা নাচ গান নাটকই হোক সবেতেই সে ছিল - সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলার মতন। কোলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে গিয়েও ছাত্রীজীবনের স্বাদটা সে ভুলতে পারেনা কিছুতেই। সাংসারিক কাজেও কোলকাতায় আসা হয় না সহজে। বন্ধুরা অনুযোগ করে। আত্মীয়স্বজনরা না আসার কারণ নিয়ে অনেক কিছু বলেন। তার বেশীর ভাগটাই ঈর্ষার কারণে। কালো মেয়ে মল্লিকার এতভাল বিয়ে হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অনেকেই গায়ে পড়ে তার মাকে অনেক অযাচিত উপদেশ দিয়েছেন এক সময়। তাই তাদের গায়ের জ্বালাটা আরও বেশী। আত্মীয়স্বজনদের মুখ বন্ধ করা যায় না। তাই মল্লিকা বা তার বাপের বাড়ীর কেউ সে কথায় কান দেয় না। তবু গুঞ্জনটুকু তো থেকেই যায়। শ্বশুরবাড়ীর সব ঝক্কি সামলে রূপকের কাজের যে ধরণের অনিয়ম তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার দিন কেটে যায় ঝড়ের মত। পারলে ২৪ ঘন্টাটাকে ৪৮ ঘন্টা করে নেয় সে। শ্বশুরবাড়ীতে তার আদর, জনপ্রিয়তার ফল এ। এসবের পর সংসার ফেলে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে আসা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। তবু মা,বাবা যতদিন ছিলেন মাঝে মধ্যে অল্প কদিনের জন্য ঘুরে গেছে কলকাতায়। তবে বাবা-মাই বেশী গিয়েছেন মেয়েকে দেখতে। এখন তাঁদের অবর্তমানে কোলকাতার টানটা ঠিক ততটা আর নেই। যদিও ভাইরা সব সময়ই ডাকাডাকি করে। আর সবার উপরে বেশীর ভাগ বন্ধুই এখনও কোলকাতাতেই। সে টানটা কিছু কম নয়। তবু আসা হয় না। এবারও এসেছে পাঁচ বছর পর। আসলে রূপক অফিসের কাজে বিদেশে গিয়েছে মাস খানেকের জন্য। মল্লিকারও যাবার কথা ছিল। কিন্তু কাজের চাপে রূপকের সঙ্গ সে একেবারেই পাবে না। একা একা ঘুরে বেড়াতে হবে ভেবে সে ওই সময়টা কোলকাতাতে থাকাই ঠিক করে। পুরোনো বন্ধুদের কার কি রূপ দেখবে ভেবে সে অস্থির হয়ে ওঠে। চিন্তা করতে করতে তাড়াতাড়ি সব কাজ সারছে সে। এমন সময় ডোর বেল্‌টা বেজে ওঠে। দরজা খুলতে উদ্যত চাকরকে থামিয়ে মল্লিকা নিজেই ছুটে যায় দরজা খুলতে মধুশ্রী ভেবে। দরজা খুলে চমকে যায় সে। মধুশ্রী নয়, দরজায় দাঁড়িয়ে সৌম্য চেহারার এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ। অথচ সারা শরীর ঘিরে কেমন যেন একটা আনমনা উদাসীন ভাব। ভদ্রলোকও একটু সচকিত হয়ে ওঠেন ওকে দেখে। দ্বিধান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,
'সায়ন বাড়ী আছে কি'?
'সানু তো কাজে কলকাতার বাইরে গেছে। ফিরবে সপ্তাহখানেক পরে'।
'ওর স্ত্রী লাবণি, সে এখনও স্কুলে '?
'হ্যাঁ তার তো ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় '।
ভদ্রলোক যেন চিন্তায় পড়লেন, কি বলবেন, কি করবেন ভেবে। একটু দ্বিধার পরে একটা খাম বার করে মল্লিকার হাতে দিয়ে বললেন 'আমার ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। ওরা যেন নিশ্চয়ই যায়। আমি আবার একদিন আসবো।
''আপনি '? চিঠি হাতে মল্লিকার দ্বিধা ভরা প্রশ্ন।
'আমি আসছি মোড়ের ওই ৬ নম্বর বাড়ী থেকে। নাম আমার রাজেশ্বর মৈত্র।

বাড়ীর নম্বর শুনেই চমকে ওঠে মল্লিকা। হঠাৎই তার মনে হয় ভদ্রলোকের চেহারাটা কেমন যেন চেনা চেনা। কিছু একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। ভদ্রলোকের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল। বোঝার চেষ্টা করল তার অনুমান ঠিক কিনা। কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ দেখতে পেল না ও তরফে। ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে আর একবার চিঠিটা সায়নকে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন। ওঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে মল্লিকা আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে,
' ৬ নম্বর বাড়ী। রাজেশ্বর মৈত্র। রাজেশ্বর মৈত্র নামটা কোথায় যেন শোনা। কোথায়! কোথায়!!'
আর তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে যায় ।
' আরে, এ তো রাজাদা! রাজাদার ভাল নামই তো রাজেশ্বর মৈত্র '।
পরমূহুর্তেই অভিমান জমে ওঠে সারা মন জুড়ে। রাজাদা তাকে চিনতে পারল না। কিন্তু রাজাদাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? চিনতে সে-ও তো পারে নি। এমন কি নামটা শোনার পরেও না। যে নামটা শুনলে পরে আজও বুকে কাঁপন ধরে তার, তাকে কিনা চিনতে পারল না সে! রাজাদা তার প্রথম প্রেম বা ভালবাসা। যদিও একতরফা। তাঁকে চিনতে না পারার ক্ষোভে সারাটা মন ভরে ওঠে মল্লিকার। কি করবে সে ভেবে

পায় না। নিজেকে শান্ত করতে আনমনা মল্লিকা ফিরে যায় তার সদ্য কৈশোর ছাড়ান বয়েসটাতে। তখন পৃথিবীটা ছিল রঙ-এ - রসে -গানে ভরা। আর মনটা ভরা ছিল রঙীন স্বপ্নে। পাড়াতে রাজাদা তখন তরুণদের মধ্যমণি। উঠতি বয়েসী সব মেয়ের চোখে-ই নায়ক। মল্লিকারাও সে দলের। রাজাদা যে খুব কথা বলতেন তা নয়। তবু তার চালচলনে এমন কিছু একটা ছিল যাতে সকলের মধ্যে থেকে চোখে পড়ত। রাজাদের একটা দল ছিল আট দশ জনের। ছুটির দিনে রাজাদাদের বাড়ীর বাইরের ঘরে চলতো তাদের গুলতানি। সঙ্গে থাকত গান আবৃত্তি, বাজনা। পাড়ার নানান ব্যাপারে সাহায্য করা, কারুর বিপদে বুক দিয়ে পড়া ছিল তাঁদের কাজ। ওঁদের ভরসাতেই অনেক সময় বৃদ্ধ মা বাবাকে রেখে লোকেরা শহরের বাইরে যেতে সাহস পেত। আবার পাড়ার মেয়েরাও নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারতো। তখন পাড়ার সকলেই সকলকে চিনতেন। তাই পাড়ার ছেলেরা তো বটেই বেপাড়ার চ্যাংড়া ছেলেদেরও সাহস ছিলনা কোনও মেয়ের পিছনে লাগার। এমনই সব ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। মল্লিকার হঠাৎ মনে পড়লো ছোটকাদার কথা। রাজাদার বন্ধু হলেও বয়সে একটু বড় ছিলেন সকলের চেয়ে। সকলে তাই সমীহ করতো। খুব কথা বলতেন আর সব সময় মুখ ভর্তি পান। কি পান খেতেই না ভালোবাসতেন! সর্বক্ষণ মজার মজার কথা বলে হাসাচ্ছেন। মল্লিকা - মধুশ্রী আর আত্রেয়ী ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী। ছোটকা ওদের ডাকতেন ত্রয়ী, কখনও বা থ্রী মাস্‌কেটিয়ারস বলে। শুধু তাইই নয়, নাম মনে রাখতে পারতেন না বলে পাড়ার মেয়েদের নিজস্ব ভঙ্গীতে নাম দিয়েছিলেন। মল্লিকাকে ডাকতেন রঙ্গনা বলে। মধুশ্রী ছিল রঞ্জনা আর আত্রেয়ী নন্দনা। এমনই আরও কত নাম! দেখা হলে বলতেন - 'কোনও ছেলে পিছনে লেগে বিরক্ত করছে না তো? লাগলেই বলবি কিন্তু। কার ঘাড়ে কটা মাথা দেখবো '।

এধরণের দাদারা পাহারা দিতেন বলেই পাড়ায় শান্তি ছিল। ছোটকাদা একটা সময় গান করে বেশ নাম করেছিলেন। তখন ছিল রেডিওর যুগ। এখন টিভি-র মত সেখানে মুখ দেখা যেত না। কখনও যদি ওরা ছোটকাদাকে রেডিওতে ওর গান শোনার কথা বলেছে তো তখনই উত্তর পেয়েছে, ' আরে দূর, ওটা যে আমি সেটা তোদের কে বলল? আরে বাবা, আমার এই চেহারা আর বটর বটর শুনে আমাকে তোদের গাইয়ে বলে মনে হয়? ওটা আমি নয় রে, ওটা দাদা গাইছিল।'
বলেই হা হা করে হেসে উঠতেন। ওরা তখন তা মেনে নিয়েছে কয়েকটা কারণে। এক নম্বর কারণ রেডিওতে চেহারা দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত ওঁর দাদাও সত্যিই ভালো গাইতেন আর ওঁর ভালো নামটা ওরা ঠিক জানতো না। পাড়ার ফাংশানে গান করতেন। তা তো পাড়ার ছেলে হিসাবে। কাজেই মল্লিকারা বহুদিন পর্যন্ত ওর আসল পরিচয়টা জানতে পারেনি। আর যবে জেনেছে যে ছোটকাদা আর গায়ক অরুনাভ গাঙ্গুলী একই লোক ততদিনে ছোটকাদা মারা গেছেন। মল্লিকার মনটা ভার হয়ে ওঠে। কি সুন্দর দিনগুলি ছিল তখন!

আর একটা জিনিস মল্লিকার মনে পড়ে যা আজকাল আর দেখা যায় না। তা হোল সারা পাড়া যেন একটা একান্নবর্তী পরিবার। একটাই পুজো হোত। পুজোর সময় চাঁদার কোনও অত্যাচার ছিলনা। প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত তা শক্ত হাতে পরিচালনা করতেন রাজাদাদের দল। কত শান্তি ছিল তখন!
তখনকার দিনে বেশীরভাগ বাড়ীই ছিল যৌথ পরিবার নিয়ে। মল্লিকাদেরও ছিল তাই। মধুশ্রীদেরও। আবার মৈত্রদের পরিবারও। রাজাদারই এক দিদির কাছে মল্লিকা যেত সেলাই আর আঁকা শিখতে। মালতীদি ছিলেন রাজাদার জ্যেঠতুত দিদি। খুব সুন্দর সেলাই জানতেন। আঁকাও শেখাতেন। মল্লিকাকে স্নেহ করতেন খুব। ওঁদের বাড়ী গেলেই একবার রাজাদার ঘরে ঢুঁ মারতো মল্লিকা। আর অবশ্যই রাজাদার অনুপস্থিতিতে। টেবিলটা একটু গুছিয়ে রাখা , কখনও একটু ফুল সাজানো। বেশীরভাগ সময়ই দুটো তিনটে চাঁপা ফুল প্লেটে রেখে আসতো। এই ধরণের পাগলামী ছিল তার। মালতীদি হাসতেন। হয়তো একটু প্রশ্রয়ও ছিল সেই সঙ্গে। রাজাদার মনোভাব সে কোনদিন বোঝে নি। উনি জানতেন কিনা তাও জানে না। ওঁর দিক থেকে রাগ বা অনুরাগ কোনটাই ছিল না বোধহয়। মাঝে মধ্যে দেখা হয়ে গেলে মৃদু হাসতেন বা হয়তো কুশল প্রশ্ন করতেন এই পর্যন্ত। মল্লিকা তাতেই কৃতার্থ হয়ে যেত। এই একতরফা ভালোবাসা নিয়ে সে কত স্বপ্নই না দেখেছে। কিন্তু তা স্বপ্নই রয়ে গেছে। একসময় রূপকের সঙ্গে তার বিয়ে হোল। কলকাতা ছেড়ে চলে গেল চিরদিনের মতন। রূপকরা বেশ কয়েক পুরুষ ধরে ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্টিত। তার পর সংসারের জালে জড়িয়ে একসময় সবকিছুই চাপা পড়ে গেল। রাজাদার বিয়ের খবরটা পেয়েছিল। তারপর কবে একবার যেন শুনেছিল রাজাদার অসুস্থতার খবর আর তারপর থেকেই নাকি মাথার একটু গন্ডগোল। শান্ত মানুষটি নাকি আরোই চুপচাপ হয়ে গেছেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। শুধু আপন মনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। বাড়ীর লোকেরা সঙ্গ দেওয়ার জন্যে সর্বক্ষণ লোক রেখেছে। কিন্তু রাজাদা অনেক সময়ই তাকে এড়িয়ে একা বেরিয়ে পড়েন। যেমন আজ। সেই রাজাদা আজ নিজে এসেছিলেন ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। আর দুজনেই কেউ কাউকে চিনতে পারলো না। আশ্চর্য !!

হঠাৎ কি এক অসীম কষ্টে মল্লিকার দুচোখ জলে ভরে গেল। রাজাদা কি ইচ্ছা করে তাকে চিনলেন না? কে জানে। মল্লিকা চেষ্টা করে এই ধাঁধার মীমাংসা করতে। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। বাইরে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। মধুশ্রী এসে পড়েছে। চোখের জল মুছে ব্যাগ হাতে মল্লিকা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল ॥

বিচ্যুতি

শঙ্কর বসু

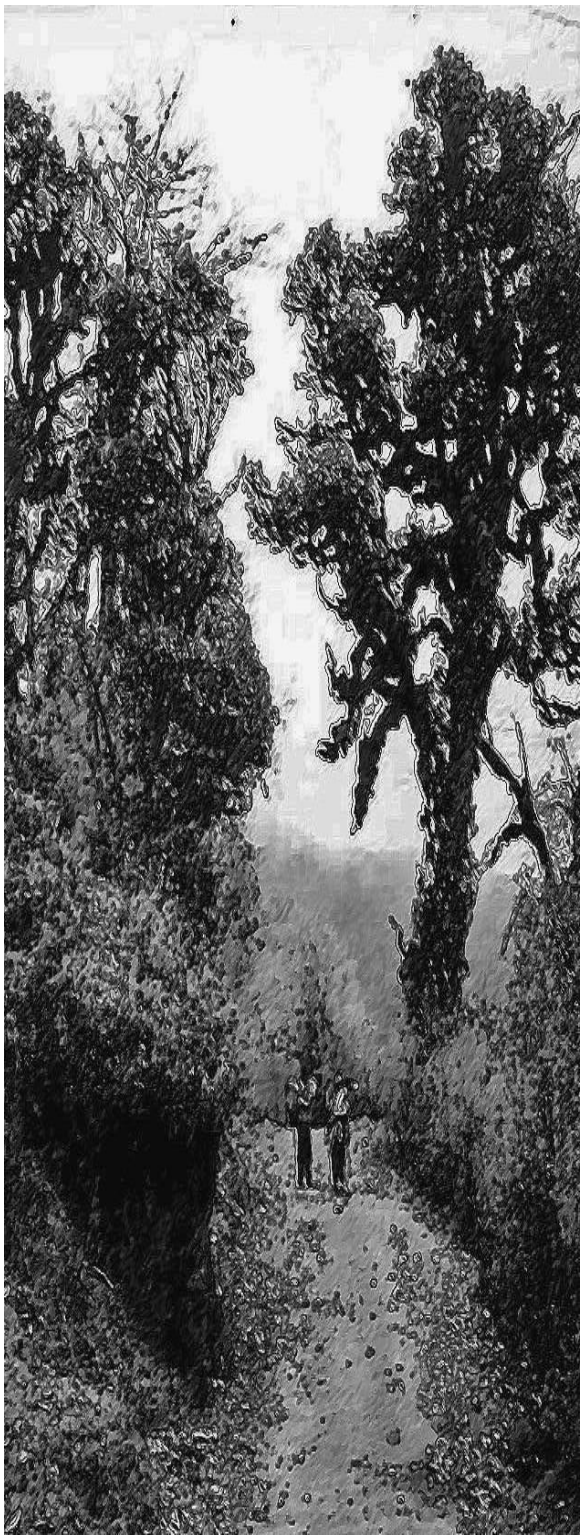

সকালবেলায় অফিসের কাগজপত্র রাখতে গিয়ে দেরাজের কোণা থেকে বেরোলো খামটা - বেশ হলুদ হয়ে গেছে, খানিকটা আরশোলার উদরস্থও হয়েছে দেখে মনে হলো। আলগোছে খামটা খুলতেই বেরোলো বেশ রংচটা একটা ছবি, সঙ্গে কিছু কাগজপত্র। বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর অনিরুদ্ধর ডাউন মেমারী লেনের আলো জ্বলে উঠলো। কি যেন নাম ছিলো ছেলেটার? ও হ্যাঁ সিম্বো রোপু..... আর ওর বউ এর নাম কি যেন ? নাঃ আর মনে পড়ে না। একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এ তাঁরই হাতে লেখা চিঠি ঐ ছেলের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা হিন্দীতে। কে এক ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করেও কিছু পরামর্শ আর ওষুধের নাম লেখা ডাক্তার বন্ধু সুমিতের লেটার হেডে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে বেশ খানিকটা সময় লাগলো অনিরুদ্ধর। এ তাঁরই লেখা চিঠি প্রায় বিশ বছর আগে, কিন্তু তা ডাকবাক্সে না ফেলে এই দরাজের কোণে পড়ে থাকার রহস্য কি - এটা বেশ চিন্তায় ফেললো বার্লিন কেমিক্যালস এর দায়িত্বশীল চীফ সায়েন্টিস্ট অনিরুদ্ধ দত্তকে। অমিতার তাড়া খেয়ে ব্রীফকেসের কোণে খামটা টুক করে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন - নাঃ আর দেরী চলবে না। অফিসে আজ অনেকগুলো জরুরী রিপোর্ট ফাইনাল করতে হবে। সামনের সপ্তায় ব্যাঙ্ককে একটা বিজনেস মিটিং এর আগে এগুলো শেষ করা দরকার।

সকালের দিকে একটা হাল্কা অন্যমনস্কতা ছেয়ে রইলো। ঘটনাগুলো মনে মনে সাজানোর চেষ্টা করছেন - ভাবলেন প্রণবদাকে একটা ফোন করবেন। কিন্তু সে তো আবার ফ্রান্সে কোন এক সেমিনারে আলো করে বসে আছে। দুপুর একটা নাগাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল কুস্তাহারির কথা। ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির ছায়া মিলিয়ে গেল অনিরুদ্ধর, বেশ খানিকটা আস্থাও ফিরে এল নিজের ওপর। হুঁ- কুস্তাহারি ... সিম্বো ... পারিয়া... ঠিকই প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা।

'ইখানে আকাশের রঙ বড়ো নীল গো বাবু' হুবহু জহর রায়ের মত গলা করে প্রণবদা বললেন হাঁটতে হাঁটতে। পাহাড়ী পথের দুধারে হাল্কা সবুজের মাঝে মাঝে পলাশের রক্তিম ছটা। আকাশের নীল বড়ো তীব্র। প্রণবকে সঙ্গে নিয়ে অনিরুদ্ধ পাড়ি জমিয়েছিলেন ওড়িশার এই অখ্যাত পাহাড়ে। একটা পুরোনো আর্টিকলে দুষ্প্রাপ্য এক ভেষজের কথা লিখেছিলেন এক ব্রিটিশ সাহেব। প্রায় হারা উদ্দেশ্যে কপালঠুকে বেরিয়ে পড়েছিলেন গবেষক অনিরুদ্ধ। সিনিয়র প্রণবদাকে রাতারাতি রাজী করিয়ে হাজির হয়েছিলেন টিটলাগড়ের এই অজানা

অচেনা পাহাড়ে। স্টেশনের কাছে ভাঙাচোরা ডাকবাংলোয় সুটকেশগুলো নামিয়েই হাঁটা লাগিয়েছিলেন ধোলামুন্ডিয়ার সন্ধানে। খানিকটা ঝোঁকের মাথায় চলে এলেও হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিলেন কাজটা খুব একটা সোজা হবে না। প্রণবদাকে সেই উদ্বেগের আঁচ না দিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে শিষ দিতে দিতে পায়ে পা মেলাচ্ছিলেন অনিরুদ্ধ। ঘন্টা তিনেক হাঁটাহাঁটি করে যে লোকালয়ে এসে পড়লেন তা একেবারে গন্ডগ্রাম- দেখে মনে হলো পথের বাঁকে হাতির পাল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'কিরে কিছু জিজ্ঞেস করবিতো, না কি শুধু হাঁটতেই থাকবি'? কথাটা মন্দ বলেনি প্রণবদা। একটা একচালা দোকান গোছের কিছুর দিকে এগোতে বেশ কিছু লোক চারপাশে জড়ো হয়ে গেল। ভাঙা হিন্দি আর ইংরেজীতে কিছু কথা চালাচালির মধ্যে একজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন প্রাইমারী স্কুলের টিচার বলে। একটু আধটু হিন্দী আর ইংরেজী এর আয়ত্বের মধ্যে সেটা বেশ একটা স্বস্তির কারণ বলে মনে হোল দিশেহারা দুই শহুরে বাবুর। খানিকটা আশা নিয়ে অনিরুদ্ধ দেখালেন সেই বিস্মৃতপ্রায় গাছের ছবি, বললেন তার আশ্চর্য গুণের কথা। তা মাস্টারমশায়ের মুখ দেখে মনে হোল না এমন কথা কখনো শুনেছেন। তবু বাবুদের নিরাশ না করে ইশারায় একটা রোগাটে ছেলেকে ডেকে কি সব বললেন যা দুই বন্ধুর বোধগম্য হোল না। মাস্টারমশাই এবার যা বললেন তার সারবত্তা হোল যে এই ছোকরা সিম্বো, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, কোনও কাজের নয়। ও হয়তো বাবুদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বদলে ওকে দুচার টাকা সাহায্য টাহায্য এই আর কি .... । আপত্তির কোনও কারণ এবং দ্বিতীয় কোনও রাস্তা না থাকায় দুই বন্ধু সিম্বোর অনুগামী হলেন। দুএকটা কথায় বোঝা গেল এছেলে ওড়িয়া ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথা বলতে পারেনা। ইশারায় একটু আধটু যা বুঝলেন এরা এই কুস্তাহারি গ্রামে প্রায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে টিঁকে আছে গাছপালা শেকড় বাকড় খেয়ে। ফসল এবার একটু ভাল হয়েছে, তাই কিছুদিন অন্ততঃ না খেয়ে মরার সভাবনা নেই। ঘন্টাখানেক পাক্‌দন্ডী বেয়ে প্রায় দুপুর দুটো নাগাদ ওরা যেখানে এসে পৌঁছলেন। তারপর আর রাস্তা নেই- সামনে হাঁ করে আছে অতল খাদ। সেই ছোকরা ওখানে এসে পাথরে পা ছড়িয়ে বসে ঘাসের ডাঁটি চিবুতে লাগলো। দুই বন্ধু তো হতবাক! ঘন্টা চারেকের একটানা হাঁটা, খিদে-তেষ্টা আর আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অনিরুদ্ধ অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন - এ ছেলের উদ্দেশ্য কি? 'প্রণবদা, এটাকে ঠেলে খাদে ফেলে দিই'? প্রণবের সাড়া না পেয়ে ঘুরে তাকাতেই অনিরুদ্ধ অবাক হলেন। খানিকটা দূরে উবু হয়ে মাটিতে বসে প্রণব কি যেন মন দিয়ে দেখছেন। 'অনি শিগগীর আয়' কাছে যেতেই বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল অনিরুদ্ধর। এ কি সত্যি! ঝোপের মধ্যে ইতিউতি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালচে সবুজ পাতাওয়ালা সেচিলেস জিংগোয়েল - যার প্রায় নিরানব্বই শতাংশ বিলুপ্ত পৃথিবী থেকে। একটা শিহরণ চলে গেল মাথা থেকে পা হয়ে। ভালো করে নমুনা সংগ্রহ করে জায়গাটার একটা মানচিত্র বানিয়ে দ্রুত ফিরে চললেন দুই গবেষক কলকাতার উদ্দেশ্যে। ফেরার পথে সিম্বোর হাতে কড়কড়ে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিতে অবশ্য ভোলেননি অনিরুদ্ধ এবং তা নিতে আপত্তিও করেনি ছেলেটা।

নতুন আবিষ্কার আর তার প্রয়োগের গবেষণায় খ্যাতি জুটেছিলো অনিরুদ্ধের। বেশ কিছু গবেষণাপত্র মায় তালবুঝে একটা ভালো চাকরীও জুটে গিয়েছিলো। আরও কিছু নমুনা সংগ্রহের জন্য পরের বছর এক জার্মান সাহেবকে বগলে করে অনিরুদ্ধ আবার হাজির হয়েছিলেন কুস্তাহারিতে। গোটা আবিষ্কারের গল্পটা সাহেবকে বলার পর সেই সাহেব সিম্বোর মুখ দেখে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিলেন অ্যামেজিং , অ্যামেজিং। বেশ খানিকটা হাল্কা মেজাজে সিম্বোর বাড়ীর দাওয়ায় বসে সাহেবের সঙ্গে বাৎচিত চলছে এমন সময়ে সিম্বোর পেছনে পেছনে একটা দুবলা, পাতলা, শ্যামলা মেয়ে এসে এদের সামনে দাঁড়ালো চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে। একটু অপ্রস্তুত হলেও অনিরুদ্ধ বুঝলেন মেয়েটি সিম্বোর ঘরণী। বেশ অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার হিন্দীতে মেয়েটি জানালো যে ও পারিয়া -সাত মাস আগে সিম্বোর সাথে ওর বিয়ে হয়েছে। তা এমন মিলনান্তক দৃশ্য দেখে সাহেব তো খুব খুশী- ফস্ করে একজোড়া একশো টাকার নোট সিম্বোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবদার করলেন নবদম্পতির একটা ছবি নেবেন। ব্যাস ছবিতোলার কথায় মিয়াবিবির কি প্রাণপণ তোড়জোড়। আধঘন্টা বাদে নতুন জামাকাপড় পরে চুল আঁচড়ে একেবারে শবর শবরী। বেশ খানিক্ষণ কেটে গেছে, ওরা ওঠবার তোড়জোড় শুরু করেছেন - এমন সময়ে অনিরুদ্ধ আড়চোখে লক্ষ্য করলেন দুরে তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কি যেন শলা পরামর্শ চলছে মিয়াবিবির। চোখে চোখ পড়াতে সিম্বো এসে অনিরুদ্ধের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। 'সিম্বো কিছু বলবে '? সিম্বো মাথা না তুলে ঘাড় নেড়ে ওর ঘরের দিকে হাত দেখালো। খানিকটা কৌতুহলের বশে ঘরে ঢুকেই অনিরুদ্ধ বুঝলেন ব্যাপারটা গুরুতর। সমস্যাটা খুব একটা নতুন নয় - এই দম্পতি সন্তান চায় কিন্তু কি একটা সমস্যা আছে পারিয়ার। ওরা ব্লকের হেলথ সেন্টারে গিয়েছিলো, সেখানকার ডাক্তারবাবু বলেছেন একটা অপারেশান করতে হবে। সিম্বোর বদ্ধমূল ধারণা ওর বউ নির্ঘাৎ মরে যাবে। আবার এই সমাজে নিঃসন্তান হওয়া খুবই লজ্জা আর অপমানকর। সিম্বো আর পারিয়া যে সামাজিকভাবে খানিকটা বিচ্ছিন্ন তা এদের আহত চেহারায় স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেন। সিম্বোর কলকাতায় আসার প্রবল বাসনাকে প্রশমিত করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরো মেডিক্যাল হিস্ট্রির একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে আনলেন ডাক্তার বন্ধু সুমিতের জন্য। তা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক কোনও সমাধানসূত্র বার করতে না পেরে একটু অসহায় বোধ করছিলেন অনিরুদ্ধ। তারপর যা হয়েছিলো অনিরুদ্ধ এবার ছবির মতো দেখতে পাচ্ছেন - লোভনীয় চাকরী, দ্রুত মনস্থির করা এবং অবিলম্বে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমেরিকা যাত্রা। কর্মকান্ডের এই ঝড়েও সিম্বোর ঘটনাটার একটা সুরাহা

করেছিলেন - সুমিতের পরামর্শ সমেত কিছু কাগজপত্র আর সাহেবের তোলা ফোটোগ্রাফ খামস্থ হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্তই .... বাকীটা এখন বুঝতে পারছেন।

কুড়ি বছর আগের একটা আলগা বিচ্যুতি এমনকিছু বিবেক দংশনের কারণ হতে পারে না। তবু অনিরুদ্ধর কোথাও যেন একটা বেসুরো ঠেকছিলো। একটা সফল পরিতৃপ্ত জীবনের প্রায় অপরাহ্নে এসে এমন একটা ছোট ভুলও মেনে নিতে অসুবিধে লাগছিলো। রাতে খাবার টেবিলে অমিতারও ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি। দিন দুই কাজের প্রচন্ড চাপের মধ্যেও ব্যাপারটা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাঙ্কক থেকে ফিরে পরের সপ্তায় প্রণবের ফোন পেয়ে অনিরুদ্ধ মনস্থির করে ফেললেন। 'প্রণবদা যাবে নাকি এ্যাডভেঞ্চারে '? এই ধরণের কাজে প্রণবের উৎসাহ যে বাড়াবাড়ি রকমের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিলোনা অনিরুদ্ধের। তিনদিন পর শনিবার রাতে ট্রেনের কামরায় বসে খুব সংক্ষেপে প্রণবকে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন অনিরুদ্ধ। ' সে কি তাদের মনে আছে? তাও চল দেখা যাক ' প্রণবদার আপাত গা-ছাড়া মনোভাবের আড়ালে চাপা উৎসাহ অনিরুদ্ধর দৃষ্টি এড়ায়নি।

রাতের হাল্কা বৃষ্টির পর ধোলামুন্ডিয়ার ধোওয়া মোছা ছবিটা যেন কুড়ি বছর আগের সেই সময়টাকে মনে করিয়ে দেয়। গ্রামে যেতে গেলে এখন ট্রেকার মেলে, পথে দুচারটে মোটর বাইকও চোখে পড়লো। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততার ছাপ এই পলাশতলীতেও পড়েছে - একথা বুঝতে কোনও অসুবিধে হোলনা। গ্রামের যত কাছে আসতে লাগলেন, একটা অনিশ্চয়তার দোলাচল চলতে লাগলো অনিরুদ্ধর। প্রায় ঘন্টাখানেক জিজ্ঞাসাবাদের পর খোঁজ মিললো সিম্বোর - সে এখন ঘর বেঁধেছে তেড্ডাশা গাঁয়ে - সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। একটু অস্বস্তি পেয়ে বসছিলো অনিরুদ্ধর - কিভাবে রিঅ্যক্ট করবে কে জানে? প্রণবের মুখ দেখেও কিছু বোঝা যাচ্ছেনা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রঙচটা ফোটোগ্রাফটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। হাতের তালুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাটির দাওয়ায় কাঁচাপাকা চুলের বসে থাকা মানুষটাকে সিম্বো বলে চিনতে খুব অসুবিধে হোলনা। দুয়েকটা কথা চালাচালির পর এটুকু বোঝা গেল যে এ লোক এঁদের চিনতে পেরেছে। প্রণবদা হাল্কা কথাবার্তা চালালেও অনিরুদ্ধর সংকোচটা কিছুতেই কাটছিলোনা - ঠিক কিভাবে কথাটা পাড়বেন। এখন মনে হচ্ছে কি দরকার ছিলো ঝোঁকের মাথায় এভাবে চলে আসার। চটক্‌টা ভাঙলো একটা ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখে। ' মোর পিলা অছি বাবু ' সেকথা সিম্বো না বললেও আন্দাজ করতে অসুবিধে হোত না। এতো কুড়ি বছর আগের সিম্বোরই প্রতিচ্ছবি। তবে কি? ..... অনেক কিছু প্রশ্ন মুখে এসে গিয়েছিলো কিন্তু কিছু বলার আগে সেই পিলা সিম্বোর ইশারায় ঘরের ভেতর দিকে চলে গেল। খানিকবাদে রঙিন শাড়ী পরা এক দেহাতী মহিলাকে আসতে দেখে অনিরুদ্ধ রক্তচাপ অনুভব করলেন। 'মোর বিবি' - সিম্বোর কথার প্রত্যুত্তরে ফস করে 'পারিয়া' কথাটা অনিরুদ্ধর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সিম্বো বোধহয় কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে। ' এ লখি অছি - মোর বুধুয়ার মা ' - ও, এ তাহলে সিম্বোর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ! কিন্তু পারিয়ার কি হোল? তবে কি খুব খারাপ কিছু। নাঃ আর ভাবতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে হাল্কা সুরে সিম্বো যা বললো তার মানে দাঁড়ালো পারিয়া ঐ দূরে কোথাও চলে গেছে। খানিকটা আবেগের বশে সিম্বোর দুহাত ধরে কিছু বলতে গিয়ে অনিরুদ্ধ বুঝতে পারলেন সিম্বোর দৃষ্টি এখনো মাঠের থেকে সরে নি। একটু ধাতস্থ হয়ে সিম্বোর দিকে তাকাতেই সিম্বো এবার মুখ ফিরিয়ে হাসলো। ' কি যে বলেন বাবুরা - পারিয়া পিলা দিতে পারলো না তো আপনার দোষ হয়ে গেলো - এ কথা শুনে ধোলামুন্ডিয়ার বাচ্চারাও হাসবে'। উকে সুরুপতির হাতে দিয়ে দিলাম আর লখিকে শাদি করলাম '। এতে ভুল কি হোল এতো সিম্বোর মাথায় ঢুকছেনা। কথার মাঝখানে বুধিয়ার মা তিনটে চায়ের গেলাস দাওয়ায় রেখে গেল। বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ.... তিনজনের দৃষ্টি মাঠের দিকে। মাঝে মাঝে চায়ের সুরুৎ সুরুৎ শব্দ।

এমন একটা ঘটনার এমন আবেগহীন পরিসমাপ্তি দুই বন্ধুর কেউই ভাবতে পারেননি। 'কি বোকা বোকা হোল বলো তো ব্যাপারটা ' প্রণবের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে বুঝলেন ঠিক কথাটা বলা হোলনা। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ট্রেকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পকেট থেকে অনিরুদ্ধ বার করলেন সেই পুরোনো ফোটোগ্রাফখানা। প্রায় না করা একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এত সহজে হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেলেন। থাক না, থেকে যাক না কুড়ি বছরের পুরোনো একটা লজ্জার মুহূর্ত অনিরুদ্ধ দত্তর 'কীর্তিময় যশময় জীবনের শিরোপাগুলোর একপাশে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছবিটা রাখতেই শুনতে পেলেন প্রণবের ডাক - ' চল ট্রেকার এসে গেছে ' ।।

ইযু-র নর্তকী

(সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইয়াসুনারী কাওয়াবাতার "ইযু নো ওদোরিকো র" সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)

রুমা গুপ্ত

স্কেচ - রণি গুপ্ত

পাহাড়ে সীডার গাছের বনে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ লক্ষ্য করে। ঊনিশ বছরের জীবনে এই প্রথম একা ইযু উপদ্বীপ ভ্রমণে বেরিয়েছি। পরণে ছাত্রদের পোষাক। গাঢ় রঙের কিমোনো, মাথায় স্কুলের টুপি, কাঁধে বই-এর ব্যাগ, পায়ে কাঠের উঁচু খড়ম। উপদ্বীপের মধ্যাঞ্চলে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণে ইতিমধ্যে তিন রাত কাটিয়েছি। টোকিওর বাইরে আজ আমার চতুর্থ দিন। এবার আমাগি গিরিপথ অতিক্রম করে যাব ইযু-র দক্ষিণ দিকে।

শরতের ইযু ভারী চমৎকার। দূরে সারিসারি পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ বনানীর শোভা অতুলনীয় হয়ে উঠেছে নানা রঙের সমাবেশে। নীচে গভীর উপত্যকা। সব মিলিয়ে এক অপরূপ পরিবেশ। তবে আজ আমার পথ চলার প্রধান আকর্ষণ রূপসী প্রকৃতি নয়, একটি প্রত্যাশা। বৃষ্টির তেজ বাড়তে দেখে ছুটতে শুরু করলাম। গিরিপথের মুখে একটি চায়ের দোকান। ভাবিনি এখানেই ওদের দেখা পাব।

নর্তকীদের দলটি চায়ের দোকানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ছোটখাটো চেহারার নর্তকী মেঝেতে বসে আছে একটি

আসনের উপর। আমাকে দেখেই সেটি বিনীতভাবে এগিয়ে দিল। কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা সংকোচ - আমার মনের এক অদ্ভুত অবস্থা। মেয়েটির ভদ্রতার উত্তরে বিড়বিড় করে যা বলে বসলাম, সেটা মোটেই উপযুক্ত হল না। তারপর আমাকে কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাতে দেখে এগিয়ে দিল একটি ছাইদান। এবারও ঠিক করে ধন্যবাদ জানাতে ব্যর্থ হলাম।

মেয়েটির বোধহয় বছর ষোল বয়েস। পুরোনো স্টাইলে মাথার উপর উঁচু করে বাঁধা চুল। ডিম্বাকৃতির সুডৌল শান্ত মুখখানার তুলনায় খোপাটি বেশ বড়, তবে বেমানান নয়। ছবিতে প্রাচীনকালের সুন্দরীদের কেশসজ্জায় যে আতিশয্য দেখা যায়, কিছুটা যেন সেইরকম। সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন নর্তকী, চব্বিশ পঁচিশ বছরের একজন যুবক আর কড়া চেহারার বছর চল্লিশের এক মহিলা। সম্ভবত ইনিই দলের নেত্রী।

ছোট নর্তকীকে এর আগে দুবার দেখেছি। প্রথমবার, ইয়ু উপদ্বীপের মধ্যাঞ্চলে লম্বা একটি সেতু পার হওয়ার সময়। ওর কাছে ছিল একটি ড্রাম। সঙ্গে অন্য দুজন নর্তকী। সেদিন ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার পরও বার বার ফিরে তাকিয়েছি। ভ্রমণের আকর্ষণ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ গতকাল রাত্রে। মেয়েটি তখন সরাইখানায় নাচ দেখাচ্ছিল। মনে মনে ভেবেছি, আগামীকাল ইউগানো যাওয়ার পথে পনেরো মাইলের মধ্যে কোথাও না কোথাও আবার দেখা হবে। সেই প্রত্যাশাতেই আজ পাহাড়ী পথে বৃষ্টি উপেক্ষা করে দ্রুত হেঁটে এসেছি। তবে ভাবিনি চায়ের দোকানেই দেখা পাব। আমার ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগলো।

এই দোকানটির মালিক একজন বৃদ্ধা। তিনি এসে আমাকে যে ঘরে নিয়ে বসালেন সেখান থেকে নীচের গোটা উপত্যকাটি নজরে আসে। ততক্ষণে আমার গায়ে কাঁপুনি দিতে শুরু করেছে। বৃদ্ধা গরম চা নিয়ে ফিরে এলে তাঁকে জানালাম আমার শীত করছে।
'করবে না? ভিজে যে একশা! এদিকে এসো, জামাকাপড় শুকিয়ে নাও। ' বৃদ্ধা নিয়ে গেলেন আরেকটি ঘরে। সেখানে এক কোণে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের পাশে বসে কিমোনো শুকিয়ে নেওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু তাপে মাথা গেল ধরে।
কানে এল বৃদ্ধা নর্তকীদের সাথে গল্প জুড়েছেন।
'আরে এই সেই মেয়ে! এত বড় হয়ে গেছে! দেখতেও তো ভারী মিষ্টি! সত্যি, মেয়েরা যে কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে!'

ঘন্টাখানেক পর টের পেলাম নর্তকীদের দলটি আবার রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছে। আমি নড়ে চড়ে বসলাম। কিন্তু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে যে ওদের সঙ্গ নেব, তা পারলাম না। অস্থির মনে বসে রইলাম আগুনের পাশে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, মেয়েমানুষ, কত আর জোরে হাঁটবে। এক আধ মাইল এগিয়ে যদি যায়ও, পা চালালে ঠিক ধরে ফেলব। আমার মনটা তখনই যেন নাচতে নাচতে ওদের সঙ্গে রওনা দিল।
'রাত্রে ওরা কোথায় থাকবে জানেন? বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলাম।
'তা কি করে বলব? নাচিয়ে দল, যেখানে নাচ দেখিয়ে পয়সা পাবে সেখানেই থাকবে।' মন আনন্দে টগবগ করে উঠল। ভাবলাম, তাই যদি হয়, ছোট নর্তকী আজ রাতে আমার ঘরেই থাকবে।

বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে। পাহাড়ী পথের ওপরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। যদিও বৃদ্ধার ধারণা মিনিট দশেকের মধ্যে বৃষ্টি পুরোপুরি থেমে যাবে, তবু আমি আর অপেক্ষা করলাম না।
'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বৃদ্ধা ছুটে এলেন পিছন পিছন। 'এত বেশী দিচ্ছ কেন?' চায়ের দাম বাবদ আমি নাকি বেশী পয়সা দিয়ে ফেলেছি। বাড়তি পয়সা ফেরৎ দেওয়ার জন্য বৃদ্ধা অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, বই-এর ব্যাগ টেনে ধরে আমাকে থামানোর চেষ্টা করলেন। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এর একটা প্রতিদান তোমার পাওনা রইল। ফেরার পথে এস কিন্তু, ভুলে যেও না।'
পাহাড়ী পথ এবার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকছে। আমাকে এই পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা ফিরে গেলেন । সুড়ঙ্গ পার হওয়ার পর সরু পথটি বিদ্যুতের ঝিলিকের মত এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গিয়েছে। একপাশে সাদা রেলিং। নর্তকীদের দেখতে পেলাম। মাঝখানে মাত্র আধ মাইলের ব্যবধান, অনায়াসেই পুরিয়ে নেওয়া গেল, কিন্তু সংকোচ হোল পাশাপাশি হাঁটতে। না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তখনই দলের পুরুষ সদস্যটির নজরে পড়ে গেলাম।
'খুব তাড়াতাড়ি হাঁটেন দেখছি? ভাগ্যিস বৃষ্টিটা থেমেছে।'
যাক্ কথা বলার অছিলায় নর্তকীর কাছাকাছি থাকা যাবে। পুরুষটির পিঠে একখানা বেতের বাক্স। বয়স্কা মহিলার হাতে একটি কুকুর ছানা, দুই তরুণী নিয়েছে দুটি পোঁটলা আর ছোট নর্তকীর কাছে আজও সেই ড্রাম।
'হাইস্কুলে পড়ে বোধহয়' - তরুণীদের একজনকে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শুনে যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছি, অমনি সে খিলখিল করে হেসে উঠলো।
'সেটা বোঝা এমন কি আর কঠিন' ছোট নর্তকী জবাব দিল।
পুরুষটি জানাল, ওরা এসেছে ইয়ু দ্বীপপুঞ্জের ওশিমা থেকে। সারা বসন্তকাল ইয়ু উপদ্বীপ ঘুরে নাচ দেখিয়ে শীত পড়তে শুরু করায় বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে, কারণ সঙ্গে গরম জামাকাপড় নেই। তবে পথে কয়েকদিন শিমোদায় কাটানোর ইচ্ছা। আড় চোখে তাকালাম উঁচু খোপা আর ছোটখাটো শরীরটির দিকে। আরও যেন আকর্ষণীয় লাগল। কথা শুরু হল ওশিমা নিয়ে।
'ওশিমায় বহু ছাত্র সাঁতার কাটতে আসে জান?' নর্তকীর প্রশ্ন পাশের তরুণীকে। পিছন ফিরে জানতে চাইলাম, ' গরমের সময় নিশ্চয়ই?'
' না , না শীতকালেও ', জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু খুব নীচু স্বরে।

'শীতেও?'
এবার নর্তকীর নিজেরও যেন সংশয় হচ্ছে। অপ্রস্তুত হয়ে হাসল একটু।
' সাঁতার কাটতে বুঝি শীতকালেও যায় ' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। নর্তকীর মুখ লজ্জায় লাল। সে সামান্য ঘাড় নাড়ল।
' এ্যাই তোর কি মাথা খারাপ?' হেসে উঠলেন বয়স্কা মহিলা।

ছ সাত মাইল দূরে ইউগানো। সারি সারি টালির ছাদের বাড়ি। নদীর পাশ দিয়ে চলেছে পথ। ইতিমধ্যে পুরুষটির সাথে বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। আমিও শিমোদায় যাব শুনে খুব খুশী। একটা পুরোনো গোছের সরাইখানার সামনে এসে বয়স্কা মহিলাটি যেই আমাকে বিদায় জানাতে গিয়েছেন, তখনই পুরুষটি বলে উঠল, ' উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন'।
'ও তাই বুঝি! যাত্রাপথে ভাল সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। চলুন সরাইখানায় ঢুকে বিশ্রাম নিই '।
উঠে গেলাম সোজা দোতলায়। জীর্ণ তাতামি মাদুরের মেঝে আর কাগজের দরজা। চা পরিবেশন করছে ছোট নর্তকী। আমার সামনে এসে ওর হাত কেঁপে খানিকটা চা ছলকে পড়ল।
'বয়েসটা বিপদজনক '! চোখ কপালে তুলে মন্তব্য করলেন বয়স্কা।
আমার বুকে মাদল বেজে ওঠে। নর্তকী আর ছোট নেই - চায়ের দোকানের বৃদ্ধাও তা লক্ষ্য করেছিলেন।

ঘন্টাখানেক পর পুরুষটি আমাকে নিয়ে গেল অন্য এক সরাইখানায়। তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল ওদের সাথেই থাকব। রাস্তা দিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নামলে নদী। নদীর এক পাশে উষ্ণ প্রস্রবণ। কাছেই একটা সেতু যা চলে গিয়েছে সরাইখানার বাগান পর্যন্ত। আমরা একসঙ্গে স্নান করতে গেলাম। জানলাম ওর বয়েস তেইশ বছর। কথায় কথায় জানাল বৌয়ের দুবার গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে।

রাত্রে শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। বৃষ্টিতে পাহাড় আবছা হয়ে গিয়েছে, ঘোলাটে নদীর জল। এই দুর্যোগে নর্তকীরা নির্ঘাৎ বাইরে বেরোতে পারবে না, তবু কেন জানি সুস্থির হতে পারছি না, কেবল ঘর বার করছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ড্রামের শব্দ। এক ঝটকায় জানালা খুলে মাথা বার করে শোনার চেষ্টা করলাম। বাইরে যেমন বৃষ্টি, ততোধিক বাতাস। আমার মাথা ভিজে গেল। চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করছি কোনদিক দিয়ে আসছে শব্দটা? একসময় ড্রামের সাথে যুক্ত হোল শামিসেনের বাজনাও। এরই মধ্যে অন্ধকার খান খান করে বেত্রাঘাতের মত ভেসে এল একটি চড়া নারী কণ্ঠ, জোরে জোরে কারুর নাম বলছে, তারপর ফেটে পড়ছে হাসিতে। সঙ্গে নারী পুরুষ মিলিয়ে আরও কয়েকটি কণ্ঠের উল্লাস। নর্তকীদের বোধহয় ডাক পড়েছে উলটো দিকের পানশালায়। খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ এখন তুঙ্গে। মন বললো, শেষ হয়ে গেলে ওরা এখানেই আসবে। খোলা জানালার ধারে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ড্রামের শব্দ কানে এলে স্বস্তি, ওখানেই আছে, ড্রাম বাজাচ্ছে। শব্দ বন্ধ হলে দুঃসহ নীরবতার পাথর বুকে চেপে বসছে। আমি যেন বৃষ্টিতে তলিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ। অন্ধকারে তাকিয়ে ভাবছি, ' ও কি করছে এখন! বাকি রাতটুকু কার সাথে থাকবে ' ? জানালা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অভিমানে বুক মুচড়ে উঠছে। উঠে গিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এলাম।
রাত প্রায় দুটো। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। সদ্য স্নাত রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ চাঁদের আলোয়। মনে হোল দৌড়ে দেখে আসি ও কোথায় আছে।

পরদিন সকাল নটায় পুরুষ বন্ধুটি এসে হাজির। আমি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছি। ওকে স্নানে আমন্ত্রণ জানালাম। স্নানঘরের নীচে বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে ওঠা নদীর জল রোদের তাপে উষ্ণ। আমার মনে এখন গতরাতের অভিমান অনেকটাই দূর হয়েছে, এমন কি জানতেও ইচ্ছে করছে, পানশালায় কাল কি হয়েছিল।
' রাত্রে বেশ জমে উঠেছিল, তাই না '?
' আওয়াজ পেয়েছেন বুঝি? এখানকার লোকেরা খুব হৈচৈ করতে ভালবাসে '।
বুঝলাম নাচিয়েদের কাছে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমি আর কিছু বললাম না।
'দেখুন দেখুন ওরাও স্নান করতে এসেছে। হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে '!
পুরুষটির কথায় তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে দেখি উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্পের আড়ালে কয়েকটি নগ্ন দেহ। ছোটখাট দেহটি ছুটে এসে দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে জলের ধারে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কি যেন বলে উঠল।
ছোট নর্তকী! ওর কচি পা আর মূর্তির মত সাদা শরীরটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল যেন একরাশ টাটকা জল আমার মনটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি হাল্কা মনে হাসতে লাগলাম। এ যে একেবারে শিশুর মত! এখনও নগ্ন দেহে রোদে ছুটে আসতে পারে! ওই অবস্থাতে বন্ধুকে দেখতে পেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অত চুলের জন্যই বোধহয় ওকে বড় দেখায়। আমি প্রাণ ভরে হাসতে লাগলাম। মনের মধ্যে জমে ওঠা মলিনতা সেই হাসিতে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমরা ঘরে ফিরে আসার পর দুই তরুণীর বড়জন ফুল দেখতে এল বাগানে। ওর পেছন পেছন ছোট নর্তকীও সেতুর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে এসেছে। তাই দেখে বয়স্কা মহিলা দাঁত খিচিয়ে উঠলেন। ছোট নর্তকীও কম যায় না! পিছন ফিরে কপট রাগ দেখিয়ে তেড়ে গেল, তারপর হাসিতে ঢলে পড়ল। সন্ধ্যেবেলায় সরাইখানার আরেক অতিথির সাথে বসে দাবা খেলছি, এমন সময় বাগানের দিক থেকে ড্রামের আওয়াজ পেয়ে উঠে গেলাম। সঙ্গীর ইচ্ছা আরও খেলে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নেই দেখে চলে গেল নিজের ঘরে। একটু পরে

তরুণীদের নিয়ে পুরুষটি আবার এসে হাজির। আজ রাতে কোথাও নাচ দেখানোর বায়না পায় নি। দাবা নিয়ে বসলাম। ওরা উঠল মধ্য রাতের পর। আমার ঘুম আসছে না। সরাইখানার সঙ্গীটিকে বললাম, ' খেলবেন নাকি '? সে মহা উৎসাহে রাজী। ঠিক করলাম আজ রাতটা খেলেই কাটিয়ে দেব।

পরদিন সকাল আটটা। নাচিয়ে বন্ধুদের সাথে আজ আমার ইউগানো ত্যাগ করার কথা। সদ্য কেনা একটা শিকারীর টুপি মাথায় দিয়ে ওদের সরাইখানায় গিয়ে দেখি সবাই শুয়ে আছে। হঠাৎ ওই অবস্থায় পড়ে কি করা উচিত বুঝতে পারছি না। আমাকে দেখে অপ্রস্তুত ছোট নর্তকী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ওর ঠোঁটে মুখে এখনও রাতের প্রসাধনের ছাপ। চোখের কোণে রুজের ফোঁটা। ছোটখাটো শরীরটির আবেদন অনেক। ওর দিকে তাকাতেই মন খুশীতে ভরে উঠল। ও হাতের তালুতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাল্কা অভিবাদন করে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। বড় তরুণী আর পুরুষটি পাশাপাশি শুয়েছিল। ওরা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী। ওদিকে বয়স্কা মহিলাটি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে বসল।
'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে জানানো হয়নি। আজ রাত্রে একটা ভোজসভায় নাচ দেখানোর বায়না পেয়েছি, তাই যাওয়া পেছোতে হোল। তবে আপনার তাড়াহুড়ো থাকলে এগিয়ে যেতে পারেন। শিমোদায় আমরা সাধারণত কোশুইয়া সরাইখানায় উঠি। খুঁজে বার করা সহজ। সেখানেই না হয় দেখা হবে'।

হঠাৎ আমার নিজেকে কেমন পরিত্যক্ত বলে মনে হোল। পুরুষটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ' কাল একসঙ্গে গেলে হয় না? পথটা গল্প করতে করতে পাড়ি দেওয়া যাবে। চলুন কাল সবাই একসঙ্গেই যাই। 'সেটা সবচেয়ে ভাল, বয়স্কা মহিলাটি সায় দিল। 'কাল আমাদের রওনা হতেই হবে, পরশু বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর ঊনপঞ্চাশ দিন হচ্ছে। শিমোদায় পৌঁছে পুজো করবো কিনা'।

রাজী হয়ে গেলাম। বেলা বাড়লে পুরুষটির সাথে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়ালাম একটি সেতুর উপর। জায়গাটি শহরের কাছেই আর ভারী মনোরম। সেতুর রেলিং এ ভর দিয়ে পুরুষটি নিজের কথা বলতে শুরু করল। আগে সে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে টোকিওর এক থিয়েটার কম্পানীতে। এখনও ওশিমায় মাঝে মধ্যে থিয়েটারে অভিনয় করে। এছাড়া ঘুরে ঘুরে নাচ দেখানোর সময় দরকার হলে নামকরা অভিনেতাদের নকল করে আসরও জমিয়ে দিতে পারে।
'জানেন জীবনে কিছুই হোল না। দেশের বাড়ীতে ভাই-ই সব দেখাশোনা করে। দলে দুই তরুণীদের মধ্যে বয়েস যার বেশী, সে আমার বৌ। আপনার চেয়ে হয়তো বছরখানেকের ছোট হবে। বেচারী এই গ্রীষ্মে দ্বিতীয় সন্তানটিকেও হারিয়েছে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা মহিলাটি হলেন ওর মা আর ছোট মেয়েটি হচ্ছে আমার বোন। বহুবার ভেবেছি, এই ব্যবসায় ওকে টেনে আনবোনা, কিন্তু শেষপর্যন্ত আনতেই হোল '।
পুরুষটি জানায়, ওর নাম এইকিচি। বৌ চিয়োকো। বোন অর্থাৎ ছোট নর্তকীর নাম কাওরু, বয়েস তের। অন্য তরুণীটি এদের অনাত্মীয়, নাম ইউরিকো, ষোল বছর বয়েস। নদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে এইকিচির গলা ধরে আসে। মনে হোল ওর চোখের কোণায় জল।

ফিরতি পথে দেখি ছোট নর্তকী কুকুর ছানার পিঠে হাত বোলাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললাম
' সরাইখানায় এসো '।
' একা যেতে পারবোনা '।
' দাদার সাথে এসো '।
কিন্তু এইকিচি এল একা। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতুতে তিনজনের কলরব শুনতে পেলাম। এইকিচি আর আমি দাবা নিয়ে বসেছি। ওরা তিনজন ঘরে ঢুকে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে এক কোণে সংকুচিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সবচেয়ে আগে সংকোচ ভেঙে বেড়িয়ে এল চিয়োকো। ওরই প্রাণবন্ত ব্যবহারে পরিবেশ ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠল। ঘন্টাখানেক পর ওরা সবাই মিলে গেল স্নান করতে। আমাকেও সঙ্গে যেতে বলেছিল। কিন্তু তিনটি অল্পবয়েসী মেয়ের সঙ্গে স্নান! রাজি হওয়ার সাহস হয়নি। একটু পরেই ছোট নর্তকী ফিরে এল আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে। ' চিয়োকো বলছে, পিঠ ঘষে দেবে '।
প্রস্তাবটি দিয়ে কিন্তু সে ফিরে গেল না, আমার সাথে দাবা খেলতে বসল। অবাক করার মত ভাল খেলে। দাবায় আমার হাত যথেষ্টই পাকা। এইকিচি আর অন্যান্যদের অনায়াসে হারাই। কিন্তু ওর কাছে হারতে বসেছি প্রায়। খেলা শুরু করেছিল টানটান হয়ে বসে। উত্তেজনায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুঁকে পড়েছে। ওর একরাশ চুল আমার বুক ছুঁয়ে যাচ্ছে। সম্বিত ফিরে এলে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এই রে! আমার যে ফিরে যেতে হবে। আজ কপালে প্রচন্ড বকুনি আছে'। বলতে বলতে দৌড়ে চলে গেল ছোট নর্তকী।

দিনটা এইকিচি আমার সঙ্গে কাটায়। সন্ধ্যেবেলায় ওদের সরাইখানায় গিয়ে দেখি ছোট নর্তকী শামিসেন অনুশীলন করছে। আমাকে দেখে বাজনাটা নামিয়ে রাখার চেষ্টা করতেই বয়স্কা মহিলা ধমকে ওঠেন। উলটো দিকের রেস্তোরাঁর দোতলায় এইকিচি তখন নো নাটকের ডায়লগ আবৃত্তি করছে। কিছুক্ষণ পর নর্তকী আমার হাতে একটা বই দিয়ে তা থেকে গল্প পড়ে শোনাতে অনুরোধ করল। আমিও একটা কিছুর প্রত্যাশায় সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। নর্তকীর গভীর আগ্রহ। খেয়াল নেই কখন ওর মাথাটা আমার কাঁধে এসে ঠেকেছে। ওর চেহারার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সুন্দর দুটি চোখ। ও যখন হাসে, মনে হয় রাশি রাশি ফুল ঝরছে। বইটা অল্পক্ষণই পড়েছি, এমন সময় রেঁস্তোরা থেকে একজন কর্মচারী ওকে ডাকতে চলে এল।
' এক্ষুণি এসে বাকীটা শুনব, চলে যাবেন না যেন '।

পরণের কিমোনোটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে সে পা বাড়াল। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ছোট নর্তকী ড্রামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বাজাতে শুরু করেছে। ছন্দময় বাজনা। ছন্দের ঢেউ ওঠে আমার বুকেও।
'ড্রাম বাজতে শুরু করলেই আসর জমে ওঠে', বয়স্কার মন্তব্য। চিয়োকো আর ইউরিকো গেল আরেকটু পরে। এর ঘন্টাখানেক পর চারজনেই ফিরে এল। 'আজ এই রোজগার হয়েছে', নর্তকী মুঠো খুলে দেখিয়ে নির্লিপ্তভাবে সবটা উপুর করে দেয় বয়স্কার হাতে। আমি বাকী গল্পটা পড়ে শোনাই। তারপর ওরা কিছুক্ষণ মৃত বাচ্চাটির স্মৃতিচারণা করে।

এই দলটি সম্বন্ধে আমার বাড়তি কৌতুহল নেই, নেই দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাবও। ওরা যে যাযাবর বিনোদনকারী, সমাজের চোখে কিছুটা নীচু স্তরের, সে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। হয়তো সেকথা ওরাও বুঝেছে আর সেইজন্যই আমাকে ভালোবেসে সম্মানের উঁচু আসনে বসিয়েছে। বার বার অনুরোধ করছে ওশিমায় ওদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য। ঠিক হয়েছে নববর্ষের সময় ওদের যে নাটক করার কথা , তাতে আমি সাহায্য করব। আগে ভাবতাম যাযাবর বিনোদনকারীদের জীবন না জানি কি কষ্টের। এখন দেখছি, তা পুরোপুরি সত্যি নয়। তাছাড়া এদের ঢিলেঢালা জীবনে আছে পাহাড় আর তৃণভূমির সৌরভ আর সুদৃঢ় পারস্পরিক বন্ধন।

মধ্যরাত্রির পর ওদের সরাইখানা থেকে উঠলাম। সদর দরজা পর্যন্ত এসে মেয়েরা আমাকে বিদায় জানাল। ছোট নর্তকী তাড়াতাড়ি আমার কাঠের খড়ম জোড়া পায়ের কাছে এগিয়ে দিল। তারপর মুখ তুলে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,
' কি সুন্দর চাঁদ! কাল এসময় শিমোদায় থাকব। আমার বড় প্রিয় জায়গা। চিয়োকোর মা নতুন চিরুনি কিনে দেবে বলেছে। আপনি আমাকে একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবেন '?
বুঝলাম শিমোদায় এমন কিছু আছে যার মধ্যে ইয়ু আর সাগামির উষ্ণ প্রস্রবণ সমৃদ্ধ এলাকায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশনকারী এই দলটি নিজেদের বাড়ীর উষ্ণতা খুঁজে পেয়েছে।

আমাগি গিরিপথের কাছাকাছি এসে সবাই মালপত্র ভাগাভাগি করে নিল। কুকুর ছানাটি যেন অভ্যস্ত পর্যটক। সামনের দুখানা পা ঝুলিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে বয়স্কা মহিলার কোলে স্থান করে নিয়েছে। সমুদ্রের ওপারে সূর্য মুখ তুলেছে, পাহাড়ী উপত্যকায় তার উষ্ণতার পরশ। চোখের সামনে ধবধবে সাদা বালির বিস্তীর্ণ তট।
' ওই যে ওশিমা, কি বিরাট দেখাচ্ছে! আপনি আসছেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে, আসছেন তো '? ছোট নর্তকী বলে ওঠে।

শরতের নির্মেঘ আকাশে ঝকঝকে রোদের জন্যই কিনা জানিনা, সমুদ্রের এক অংশকে কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। শিমোদা এখনও মাইল দশেকের পথ। এবার সমুদ্র লুকাল পাহাড়ের আড়ালে। চিয়োকো নিজের মনে অলস ভঙ্গীতে গুনগুন করে গান গাইছে। এক জায়গায় এসে দেখি গিরিপথ দুভাগে বিভক্ত। একটি অনেক বেশী খাড়া, কিন্তু যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য মাইলখানেক কমে যাবে। আমার উৎসাহে সবাই খাড়া পথটিই বেছে নিল। পথ গিয়েছে বনের মধ্যে দিয়ে। এক এক জায়গা এতটাই খাড়া যে দেওয়াল বেয়ে ওঠার মত করে উঠতে হয়। তার উপর আবার ঝরা পাতা পড়ে পিছল হয়ে গিয়েছে। আমি হাঁটুর উপর হাতের ভর দিয়ে উঠতে লাগলাম। অন্যেরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল, এখন গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের কথা বলার শব্দ কানে আসছে। কিমোনোটাকে একটু উঁচু করে কোমড়ে গুঁজে ছোট নর্তকী ছোট ছোট পা ফেলে কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও আমার সাথে কয়েক ফুটের ব্যবধান সযত্নে বজায় রাখছে। মাঝে মাঝে আমি কোনও প্রশ্ন করলে চলা থামিয়ে হেসে উত্তর দিচ্ছে। আমিও থেমে ওকে ব্যবধান ঘোচানোর সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু না, প্রত্যেকবার ও চলতে শুরু করছে আমি কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর। ফলে ব্যবধান একই থাকছে।
'টোকিওতে কোথায় থাকেন '?
' হস্টেলে! নিজের বাড়ীতে নয় '।
'আমিও একবার চেরী ফুলের সময় নাচ দেখাতে টোকিও গিয়েছিলাম। ছোট ছিলাম, তাই বিশেষ কিছু মনে নেই।
শিখরে পৌঁছে ছোট নর্তকী ঝরা পাতায় ঢাকা একটি বেঞ্চের উপর ড্রামটাকে রেখে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। তারপর তাকাল নিজের পায়ের দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন পরিবর্তন করে ঝুঁকে পড়ে আমার কিমোনোর ধুলো ঝাড়তে লাগল। ঝাড়া হয়ে গেলে বেঞ্চে বসে আমাকেও বসতে বলল। আমি বুক ভরে নিঃশাস নিলাম।
এক ঝাঁক পাখি পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে ঝরা পাতার স্তূপে বসল। খসখস শব্দে চিড় ধরল নিঃস্তব্ধতায়। আমি আঙুল দিয়ে কয়েকবার ড্রামে টোকা মারলাম। পাখিরা ওইটুকু শব্দেই সতর্ক হয়ে উঠল। 'বেশ তেষ্টা পেয়েছে' বললাম আমি।
' দেখি জল পাই কিনা ' বলে ও চলে গেল জলের সন্ধানে, কিন্তু না পেয়ে একটু পরে ফিরে এল হলুদ পাতার গাছের মধ্যে দিয়ে।
'ওশিমায় কিভাবে সময় কাটাও'? আমার এ প্রশ্নের জবাবে ও দু তিনটি মেয়ের নাম করল, ছাড়াছাড়াভাবে বন্ধুদের স্মৃতিচারণা করল, যার কোনও অর্থ নেই আমার কাছে। কিছুক্ষণ পর দুই তরুণী আর এইকিচি এসে উপস্থিত। তারও দশ মিনিট পর এলেন চিয়োকোর মা।

উৎরাই-এর সময় এইকিচির সঙ্গে কথা বলার জন্য পিছনে থাকলাম। অল্পক্ষণ পরে দেখি ছোট নর্তকী ছুটতে ছুটতে উপরে উঠছে,
' নীচে একটা ঝরনা আছে। আপনি আগে জল খাবেন, তারপর আমরা খাব '। আমি দ্রুত পায়ে ওর সাথে নেমে গেলাম। গাছের ছায়ায় ঢাকা বড় বড় পাথরের ফাঁক থেকে ঝরে পড়ছে পরিষ্কার টলটলে জল। আমি প্রথমে আঁজলা ভরে পান

করলাম। মেয়েরা ধীরে ধীরে মুখ ধুল, জলে রুমাল ভিজিয়ে নিল।

পাহাড় শেষে শিমোদা মহাসড়ক। এদিক ওদিক কাঠকয়লা বানানোর উনুন থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। এক জায়গায় থোক করা কিছু কাঠ দেখতে পেয়ে সবাই মিলে বসলাম। ছোট নর্তকী একটা গোলাপী চিরুনি বার করে কুকুরছানার লোম আঁচড়াতে লাগল।
' দাঁতগুলো ভেঙে ফেলবি যে '! সাবধান করলেন চিয়োকোর মা।
' তাতে কি, শিমোদায় পৌঁছে নতুন একটা তো পাবই '।
চিরুনিটা ও মাথায় গুঁজে রাখে। ইউগানো থেকেই ভেবে রেখেছি শিমোদায় পৌঁছে ওটা চেয়ে আমি নিজের কাছে রাখব। সেই চিরুনি দিয়ে কুকুর ছানার লোম আঁচড়ানো হচ্ছে দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।
হঠাৎ কানে এল ছোট নর্তকী বলছে, 'সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলেই দেখো চেহারা অন্যরকম হয়ে যাবে।
বুঝলাম আমার বিচ্ছিরি দাঁত নিয়ে কথা হচ্ছে। প্রসঙ্গটা হয়তো চিয়োকো উত্থাপন করেছে।, তারই উত্তরে এই সুপারিশ।
'চমৎকার লোক' - চিয়োকোর মন্তব্যে সায় দিয়ে ছোট নর্তকী বলে ' খুব ভাল, সত্যিই ভাল। আমার এইরকম ভাল কাউকে পেতে ইচ্ছা করে'।
ছোট নর্তকীর এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। যা মনে আসে অকপটে বলে। এই প্রথম আমি জানলাম এমনও কেউ আছে যে আমার মধ্যেও চমৎকারিত্বের সন্ধান পায়। ঊনিশ বছরের জীবনে আমি নিজেকে মানুষের সঙ্গবিদ্বেষী, একাকীত্বে ভোগা, সমাজে বেমানান একজন তরুণের চেয়ে আর বেশী কিছু ভাবতে পারি নি। মানসিক অবসাদই আমাকে ইয়ু ভ্রমণে ঠেলে দিয়েছে। অথচ এক্ষুনি শুনলাম, আমি নাকি একটি চমৎকার মানুষ। এই শব্দ কটির যে কি মূল্য আমার কাছে, তা বোঝাতে পারব না। তাকিয়ে দেখলাম রোদের আলোয় পাহাড় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিমোদা বেশী দূরে নয়। কয়েকটি গ্রামের উপকণ্ঠে সাইনবোর্ডে লেখা আছে, যাযাবর বিনোদনকারীদের প্রবেশ নিষেধ।

শিমোদার সর্বোত্তরে সস্তার সরাইখানা কোশুইয়া। দলের সবার সাথে আমিও উঠে গেলাম এর দোতলার চিলেকোঠায়। চিয়োকোর মা ছোট নর্তকীকে নিয়ে পড়েছেন, 'তোর কাঁধ ব্যথা করছে না? হাত ছড়ে যায় নি '?
একটুও না, ড্রাম বাজানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়াতে নাড়াতে উত্তর দিল নর্তকী।
'বেশ ভারী কিন্তু' ড্রামের ওজন পরীক্ষা করে বললাম আমি।
'হ্যাঁ, আপনার বই-এর থলির চেয়েও ভারী'।
সরাইখানাটি যাযাবর বিনোদনকারী আর ফিরিওয়ালায় ভর্তি। শিমোদায় মনে হচ্ছে সব জায়গার লোকজন স্বস্তিতে যাত্রাবিরতি করে। এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে সরাইখানার মালিকের বাচ্চারা । ছোট নর্তকী তাদের হাতে অল্প অল্প পয়সা দিল।
আমি রাত কাটাব অন্য একটি সরাইখানায়। সেখানে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ছুটে এসে নর্তকী খড়ম জোড়া এগিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'সিনেমায় নিয়ে যাবেন তো' ?

এইকিচিও সঙ্গে আসছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোশুইয়ার একজন কর্মচারী। লোকটির চেহারা দেখে তেমন শ্রদ্ধা হয়না। সে আমাদের যে সরাইখানায় নিয়ে গেল সেটির মালিক শিমোদার সাবেক মেয়র। এইকিচির সাথে স্নান করে সমুদ্রের টাটকা মাছ দিয়ে দুপুরের আহার সারলাম। তারপর এইকিচির হাতে একটু পয়সা দিয়ে বললাম, 'কাল বাচ্চার স্মৃতিতর্পণের জন্য একটু ফুল কিনে নিও। আমি কাল সকালের জাহাজেই টোকিও ফিরে যাব'।

হ্যাঁ, ঘোষণাটা আকস্মিকই বটে। আসলে আমার হাতে পয়সা ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু এইকিচিকে বললাম পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। পরে ওদের সরাইখানায় গিয়ে সবাইকেই খবরটা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিয়োকোর মা আমাকে শীতকালে ওশিমায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি চিয়োকো আর ইউরিকোকে সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম। চিয়োকোকে ভীষণ ফ্যাকাসে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারী হাত দিয়ে পেট চেপে বলল এখন কোথাও যেতে চায় না। ইউরিকো কাঠ হয়ে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছোট নর্তকী নীচে সরাইখানার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে। আমাকে দেখে চিয়োকোর মার কাছে গিয়ে সিনেমায় যাওয়ার অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল বিষণ্ন মুখে।
'দুজনে মিলে সিনেমায় যেতে চাইছে, এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে '? এইকিচি শ্বাশুড়ীকে বোঝানোর চেষ্টা করে। এইকিচি যাই বলুক, শ্বাশুড়ী অনড়। ছোট নর্তকীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ওকে কোনও কথা বলতে পারিনি।

শেষপর্যন্ত সিনেমায় আমি একাই গেলাম। একজন মহিলা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সংলাপ পড়ছেন। খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে ফিরে এলাম সরাইখানায়। জানালায় কনুই-এর ভর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। ঘুমন্ত শহর, নিস্তব্ধ অন্ধকার। মনে হোল দূর থেকে ড্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ টের পেলাম আমি কাঁদছি।

পরদিন সকাল সাতটায় প্রাতঃরাশ খাচ্ছি, এমন সময় রাস্তা থেকে এইকিচির ডাক শুনতে পেলাম। হয়তো বা আমারই সম্মানে আজ ও একটা পোশাকি কিমোনো পরে এসেছে। সঙ্গে আর কেউ নেই দেখে আমার বুকটা কেমন হু হু করে উঠল।
' আসতে ওরা সবাই চেয়েছিল, ঘরে ঢুকে জানাল এইকিচি, কিন্তু কাল রাত্রে শুতে অনেক দেরী হয়েছে, তাই সকালে উঠতে পারেনি। আমাকে জানাতে বলে দিয়েছে শীতে

আপনার আসার অপেক্ষায় থাকবে '।

শিমোদায় আজ সকালে শরতের শিরশিরে বাতাস বইছে। জাহাজঘাটায় যাওয়ার পথে এইকিচি আমার জন্য কিছু ফল আর সিগারেট কিনল। এছাড়া কিনল এক শিশি সেন্ট, নাম কাওরু।
' ওর নামও কাওরু কি না ' এইকিচি হেসে বলল। আমি আমার শিকারের টুপিখানা এইকিচির মাথায় পরিয়ে দিলাম।
জাহাজঘাটায় পৌঁছে আমার হৃদপিন্ড লাফিয়ে উঠল। ও জলের ধারে বসে আছে। আমাদের দেখতে পেয়েও কাছে এগিয়ে এল না। সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে নিঃশব্দে অভিবাদন জানাল কেবল। এখনও ওর মুখে রাতের প্রসাধনের চিহ্ন। চোখের কোণে লাল ছোপ ওর চেহারায় সতেজ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। কিছুতেই ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে না।
এইকিচি গেল জাহাজের টিকিট কাটতে। আমি নর্তকীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর আজ বাক্যালাপে উৎসাহ নেই। আজ ও কেবল তাকিয়ে আছে জলের দিকে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়ে আমার কথায় সায় দিচ্ছে, তবে প্রতিবারই তা করছে কথা শেষ হওয়ার আগেই।

জাহাজ ছাড়ার সময় হোল। আমি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে উঠতে পিছন ফিরে তাকালাম। ছোট নর্তকী ঠোঁট চেপে কান্না রোধ করছে। ভাবলাম চেঁচিয়ে বিদায় নেব, কিন্তু সামান্য মাথা নোয়ানোর চেয়ে বেশী আর কিছুই করা হোল না। ধীরে ধীরে তীর থেকে সরে যেতে লাগলাম। এইকিচি শিকারের টুপিখানা নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে। নর্তকীর হাতে দুলছে একটুকরো সাদা কাপড়।

জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে দেখছি ইযু উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত আমার চোখের সামনে থেকে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। ইযু-র নর্তকী এখন অনেক দূরে। বুক ঠেলে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। আমি আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে বসলাম।
সমুদ্র আজ বড় অশান্ত। জাহাজের দুলুনির চোটে যাত্রীদের পক্ষে বসে থাকাও কঠিন। অনেকেরই পেট থেকে খাবারদাবার বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। একজন নাবিক এসে প্রত্যেকের হাতে একটি করে পাত্র দিয়ে গেল। আমি বই-এর ব্যাগে মাথা দিয়ে সীটের উপর শুয়ে পড়লাম।

মনে গভীর শূন্যতা। জানিনা কতটা সময় কাটল, কতখানি পেরিয়ে এলাম। আমি নিঃশব্দে কাঁদছি। চোখের জলে ব্যাগ ভিজে উঠেছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম পাশে শুয়ে একটি কিশোর। সে জানাল তার বাবা ইযু-র একটি কারখানার মালিক। হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে টোকিওতে। বুঝলাম আমার স্কুলের টুপিখানা ওর নজর কেড়েছে।
'আপনার কি কিছু হয়েছে' ? কিশোরটি জানতে চাইল।
'না, মানে, আমি আজ একজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম'। সত্য গোপন করার ইচ্ছা আমার হোলনা। চোখের জল প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় বিব্রত বোধও করলাম না। শূন্যতা আর আমাকে অস্থির করে তুলছে না, বরং এই শূন্যতার মধ্যে থেকে আমার অবচেতন মন পরিপূর্ণতার আস্বাদ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কখন যে সন্ধ্যে হয়েছে টের পাই নি। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। ঠান্ডাও লাগছে। কিশোর সহযাত্রী বাড়ী থেকে আনা টিফিন বাক্স খুলল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে খেলাম এমনভাবে যেন আমারই আনা খাবার। শীতভাব দূর করতে গায়ে চাপা দিলাম ওরই ক্লোকের একটা দিক। আমার মন এমন এক শূন্যতায় ছেয়ে গিয়েছে, যখন সহযাত্রীর সহৃদয়তায় সাড়া দিতে কুণ্ঠা হয়না, সব কিছু বাঁধা পড়ে এক সুরে।

ক্যাবিনের আলো নিভিয়ে দেওয়া হোল। বাইরে থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের নোনা গন্ধের সাথে জাহাজের খোলে রাখা মাছের আঁশটে গন্ধ মিশে একটা কড়া গন্ধ তৈরি হয়েছে। পাশে শোয়া কিশোর সহযাত্রীর শরীরের ওম থেকে উষ্ণতা নিতে নিতে অন্ধকারে আমি চোখের জলের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার মাথাটা যেন পরিষ্কার জলের আধারে পরিণত হয়েছে, বুক হাল্কা করে ঝরে পড়ছে অশ্রু হয়ে। হয়তো একসময় ঝরে পড়বে শেষ অশ্রুবিন্দুটিও।

ক্ষুদ্‌দার জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

অনুপম গুপ্ত

আমাদের ক্ষুদ্‌দা মানে ক্ষুদিরাম চাক্‌লাদার কোনও বিখ্যাত লোক নন। তাঁর পূর্বপুরুষদের নামে কোনও মন্দির, রাস্তা, কারখানা বা পাঠাগার আছে বলে কখনও শোনা যায়নি। ক্ষুদ্‌দা কিন্তু কুয়োর ব্যাং হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন। কোথাও যাওয়ার তাঁর বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। বিষ্ণুপুর এবং ব্রিসবেনের মধ্যে তফাৎ জানেন না। আমস্টারডাম যেতে গেলে কি আসামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়? টাটার কাছেই কি টোকিও? আসলে ভুগোলের গোল থেকে ক্ষুদ্‌দা কোন দিন'ই বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

এতৎসত্ত্বেও ক্ষুদ্‌দার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। ঝামেলা পাকালো পুত্র এবং পুত্রবধূ যারা বর্তমানে জাপানের প্রবাসী বাঙ্গালী। তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ক্ষুদ্‌দাকে সস্ত্রীক জাপানে যেতেই হবে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানকে নিয়ে একটা ছড়া ক্ষুদ্‌দার এখনও মনে আছে -
সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোম ফেলেছে জাপানী
বোমের ভেতর কেউটে সাপ
বৃটিশ বলে বাপেরে বাপ॥

বৃটিশ যেখানে যেতে ভয় পায়, সেখানে ওদের দুজনের যাওয়া কি উচিত হবে? কি করে যেন পাসপোর্ট হয়ে গেল। অনেকটা Bank এর পাশ বুক এর মতন দেখতে - তবে অনেক দামী তো, তাই চামড়া দিয়ে বাঁধানো। visa -র office -এ officer কে দাদা যে কি বলেছিল আজও ঠিক মনে করতে পারছেন না।
ছেলের পরিচিত একজনকে দিয়ে ২৭শে এপ্রিল ২০০৭ Singapore Airllines এ দুটো টিকিট কাটা হল। প্লেন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় এটা সকলেই জানে, কিন্তু কি করে প্লেনে উঠতে হয় এটা ক'জন জানে? তবে তিনিও বীর বাঙ্গালী- প্লেনের ভেতরে কি করে যেন ঢুকে গেলেন।

প্লেন যখন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল তখন দাদা ভাবলেন তাঁর এত বছরের মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন হল। তেত্রিশ দুগুণে ছেষট্টি কোটি দেব দেবীকে শেষবারের মতন প্রণাম জানালেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর স্ত্রীকে শেষবারের মতন একটি বিদায় চুম্বন দেবেন, কিন্তু জোরালো আলোর জন্য সেটা আর হল না। তবে ভালো পানীয় ও খাবার খেতে খেতে এবং অবশ্যই সুন্দরীদের দেখতে দেখতে মৃত্যু ভয়ও চলে গেল। আর কি কি হল বৌদি পাশে থাকার জন্য জানা যায়নি। ২৮শে এপ্রিল, ২০০৭, তাঁরা দুজনেই Narita বিমান বন্দরে প্লেন থেকে মাটিতে অবতরণ করলেন।
Narita বিমান বন্দরে পুত্র এবং পুত্রবধূর উষ্ণ অভ্যর্থনায় দাদা, বৌদি আপ্লুত। দেশের বৈশাখ মাসের গরম আবহাওয়া থেকে জাপানের ১১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এ পড়ে দাদা বৌদির অবস্থা শোচনীয়। গাড়ী করে রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু বাড়ী এবং অসংখ্য fly over দেখতে দেখতে তাঁরা কাওয়াসাকি-র ফুজিমিতে এসে পৌঁছলেন। ছেলের বাসস্থান চোদ্দতলায়। Residential Flat অত উঁচুতে?

বৌমা তার শ্বাশুড়ীমাকে অর্থাৎ রমলা চাক্‌লাদার সালোয়ার কামিজ আনতে বলেছিল। বৌদি কিন্তু পরতে পারবেনা- লজ্জা করবে, ক্ষুদ্‌দা হয়তো মনে মনে চাইছিলেন একটু পরুকই না - আহা! সেই কলেজ জীবনের স্মৃতি। জাপানের মেয়েরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং হাসিখুশী, কিন্তু পোশাক বানানোর ব্যাপারে এত কৃপণ যে বৌদির হুকুম রাস্তায় বেরোলে মাথা একদম সোজা করে চলতে হবে - বাঁ দিক ডান দিক করা বারণ। অবশ্য বৌদিও জানেন সংখ্যায় এতগুলো লক্ষ্য স্থির রাখাই মুশকিল।

রাস্তায় গরু, কুকুর নেই, নেই কোন হকার। শিশি, বোতল কাগজ বিক্রীর আনন্দ থেকে এরা বঞ্চিত। তার বদলে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা ও ফুটপাথ। ক্ষুদ্‌দার দেশে রাস্তার অধিকার সকলের, একমাত্র গাড়ী চালকের ছাড়া। ওনারা সদয় হলে তবেই গাড়ী রাস্তায় চলতে পারে। জাপানে সাইকেল আরোহীকেও ফুটপাথ দিয়ে যেতে হয়। জাপানে তিন মাসে ক্ষুদ্‌দা একটাও হর্নের আওয়াজ শুনতে পাননি। এটা তো ভয়ের কথা। হর্ন যারা বানায় এবং সারায় তাদের চাকরি কি থাকবে? ক্ষুদ্‌দার শহরে ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের হর্নের সম্মিলিত decibel বলে দেয় শহরটি কত প্রাণবন্ত। প্রতি হাসপাতালের সামনে আরও জোর করে বেশী বেশী হর্ন বাজানোর রেওয়াজ, যাতে নবজাতকের কান এবং হার্ট পেশেন্টদের হার্ট আরও মজবুত হয়।

বাজারে গিয়েও কি ভাল লেগেছে? ষাঁড় কর্তৃক বাঁধাকপির পাতা চর্বণরত পরিচিত দৃশ্য নেই। মাছের বাজারে যদি উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া না থাকে তাহলে তাকে কি বাজারের আখ্যা দেওয়া যায়? ক্ষুদ্‌দাকে বলা হল এগুলোকে বলে shopping mall. কোন নোংরা নেই। সবই সাজানো- যেন কৃষ্ণনগর থেকে বানিয়ে show case-এ সাজিয়ে রাখা আছে। গাড়ী ঠেলে ঠেলে পছন্দ মতন জিনিস তুলে নাও। দরদামের কোন ব্যাপার নেই। লুঙ্গি পরার প্রচলন নেই।

ক্ষুদ্‌দার নিজের শহরের বাজারের পাশে ওদের বাজারকে বাজারের "B-Team" নয় "C -Team"ই বলা উচিত।

ক্ষুদ্‌দার দেশের wine shop গুলো জাল দিয়ে ঘেরা। যেন চিড়িয়াখানার জন্তু থাকে। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যেখান দিয়ে বোতল এবং টাকা দেওয়া নেওয়া হয়। জাপানে চারিদিকে এত বিভিন্ন ধরণের রঙীন লোভনীয় পানীয় বোতল সাজানো থাকে যে দেখলেই ক্ষুদ্‌দার নেশা ধরে যায়। আহা বেচারা বৌদি! ক্ষুদ্‌দাকে আর কতভাবে সামলাবেন। বৌদি দেখেছেন নাইট ক্লাবের পাশ দিয়ে যেতে গেলে দাদার গতিটা হঠাৎ কিরকম যেন মন্থর হয়ে যায়।

ষ্টেশন মানেই শুধু Escalator- ওঠা আর নামা , ক্ষুদ্‌দা অনেক চেষ্টা করে বুঝেছিলেন যে পা ষ্টেপএ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে রেলিং ধরতে হয় এবং রমলা বৌদিকেও সেই রকম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বৌদি কিন্তু অনেক চিন্তা করে বেশ কিছু সময় নিয়ে প্রায় একরকম ঝাঁপ দিয়ে একটা ষ্টেপে পা দিলেন এবং হাতলটা ধরলেন না, as a result বৌদির পুরো শরীরটা দাদার বুকে। লোকেরা ভাবল নিশ্চয়ই সিনেমার শুটিং হচ্ছে। আসলে বৌদির নজর দাদার দিকে- উনি যেন বাঁদিকে ডানদিকে না তাকান। এই বয়েসে ওই স্বল্প পোশাকের জাপানী সুন্দরীদের না দেখাইতো ভাল - Blood Pressure এর কথাও তো ভাবা উচিত।

ষ্টেশনের টিকেট কাউন্টার -এ কোন লোক নেই। "দাদা! দুটো ব্যাঙ্গেল লোকাল দেবেন?" এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সবই হচ্ছে। ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যাবে। সেটা অবশ্য এখানকার মেট্রো রেলেও এ হয়। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ক্ষুদ্‌দা, এখানকার নিয়মমত, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বৌদিকে টেনে হিঁচড়ে ভিড় ঠেলে উঠলেন, তখন একজন লোকও নামেনি, ওঠারতো প্রশ্নই নেই। লোকেরা তখন ভাবল হয়তো কোন উগ্রপন্থী তাড়া করেছে, অন্য গ্রহের লোক।

রাস্তায় বেরোবার সময় রোজকার মত বৌদির মুখে পান জর্দা। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে মুখ বন্ধ অবস্থায় বৌদি উম্‌ উম্‌ করে জিজ্ঞেস করছেন পানের পিক কোথায় ফেলবেন। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই সরকারী অফিস আছে যেখানে দেওয়ালে এই ধরণের কাজ করার নাগরিক অধিকার দেওয়া থাকে। দাদা কিন্তু জানেন তাঁর প্রিয় শহরের প্রতিটি কর্পোরেশন বা সরকারী অফিসের দেওয়াল এই কাজের জন্য ব্যবহৃত। কবি ঠিকই বলেছেন,
"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবো নাকো তুমি।"
এই বিষসম পানের পিক্‌ বৌদিকে গিলতেই হল। জাপান সরকারের ক্ষমাহীন অপরাধ।
রাস্তায় অজস্র ফুলের সমারোহ। কিন্তু কি আশ্চর্য! কেউ ফুল তোলেনা। বৌদি ভাবেন এরা কি তাহলে বেস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজো করে না? মহিলাদের প্রাতঃভ্রমণের আসল উদ্দেশ্যইতো ফুল চুরি করা। ফুল ফোটে মহিলা কর্তৃক বৃন্তচ্যুত হওয়ার জন্য।ওখানকার মহিলারা তাহলে কি করেন?

ছেলের পাল্লায় পড়ে অত্যন্ত দ্রুতগামী একটা ট্রেন-এ (শিন্‌কান্‌সেন) চড়তে হল। ট্রেনে উঠলে সাধারণতঃ একটু টয়লেটে যাওয়ার ইচ্ছা এবং প্রয়োজন বোধ হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য টয়লেটের দরজা খোলে কি করে? বন্ধ করা মানে কি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া? যাক্‌ গে, অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকাই ভাল।

রাস্তায়, পার্কে, ট্রেনে সর্বত্রই ছেলে মেয়ের যে ভাবে নিবিড় ভাবে সেঁটে থাকে তাতে বৌদির উষ্মা -"ছিঃ, কি ঘেন্না! তুমি কিন্তু একদম ও দিকে তাকাবেনা।" ক্ষুদ্‌দার ধারণা - সামনের জন্মে বোধহয় জাপানেই জন্মানো উচিত। প্রগতির গতি না হয় এইভাবেই শুরু হোক।

২২শে জুলাই কিছু পাওয়া এবং অনেক না পাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্ষুদ্‌দা সস্ত্রীক দেশে ফিরলেন॥

বিওয়া হ্রদ ভ্রমণ

কাজুহিরো ওয়াতানাবে

বিওয়াকো (বিওয়া হ্রদ) জাপানের সবচেয়ে বড় হ্রদ। পুরোনো রাজধানী কিয়োতোর পাশে শিগা জেলায় তার অবস্থান। বিওয়া এক বাদ্যযন্ত্রের নাম। কথিত আছে যে ভারতীয় বীণায় তার উৎপত্তি। বিওয়াকোর নামকরণ নাকি করা হয় এর আকার বিওয়া বা বীণার মত বলে।

মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিওয়া হ্রদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল এতেই সীমাবদ্ধ। সেখানে বেড়াতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যাওয়ার জন্য বিশেষ তাগিদও অনুভব করতাম না। ঘটনা চক্রে এক দিন হঠাৎ এই মস্ত বড় জলাধার প্রত্যক্ষ করতে যেতে হবে, তা ছিল একেবারে আমার ধারণার বাইরে।

ঘটনার সূত্রপাত এই বসন্তকালে। এক দিন রাতে কাজ শেষে ছেলে বাড়ি এসে বলল, ' বাবা, মা, তোমাদের সঙ্গে একটু কথা আছে '।
জিজ্ঞাসা করলাম, ' কী '? ও বলল, ' এত দিন তোমাদের বলব বলব করে বলা হয় নি, একটি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে, তাকে বিয়ে করতে চাই '। শুনে আমি আর আমার স্ত্রী হতবাক। এই ধরণের পরিস্থিতির জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না, কেননা আমাদের ছেলের বয়স মাত্র ২৪ এবং ও চাকরীতে ঢুকেছে মাত্র দুবছর আগে। মাইনে পায় এত কম তা দিয়ে সংসার চালানো মুশকিল? তাছাড়া, আমি মনে মনে বললাম, তাড়াহুড়ো করে বিয়ে স্থির করার দরকারটা কি? একটু দাঁড়িয়ে তোর চারপাশ তাকিয়ে দেখ, তোর ভালো লাগতে পারে এমন মেয়ের অভাব আছে নাকি? আমি নিজে ছেলে হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিয়ে করেছি। তা নিয়ে আজ দুঃখ করছি তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ঠিক করার আগে যদি আরো সময় নিতাম, তাহলে কোন দিকে মোড় নিত আমার জীবন? হয়তো আমার স্ত্রীও একই কথা ভাবছে মনে করে সেই প্রসঙ্গ মুখে না এনে আমি ছেলেকে বললাম ' মেয়েটি কে, কোথায় থাকে, তুই ওর মা-বাবাকে চিনিস'? উত্তরে বলল, মেয়েটির দেশ শিগা জেলায়, বিওয়া হ্রদের কাছে। ' তোমাদের এত দিন জানাতে পারি নি , তবে ওর বাড়ীতে কয়েকবার বেড়াতে গিয়েছি '।

মে মাসের শুরুতে ছেলে মেয়েটিকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল। বিয়ের ব্যাপারে ওদের দুজনের দৃঢ় ইচ্ছার কথা জেনে আমরা অভিভাবক হিসাবে সম্মতি ও অভিনন্দন জানালাম।

আগস্ট মাসে আমার গরমের ছুটীর সুযোগ নিয়ে আমরা বিওয়া হ্রদের কাছে মেয়েটির বাড়ী গেলাম ওর মা-বাবার সাথে দেখা করে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। বিয়ে কিভাবে সম্পন্ন করা হবে, রিসেপশন কোথায় হবে, কাদের ডাকা হবে, এ সব বিষয়ে দুই পক্ষের মতের কোনো অমিল না থাকায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম তাতে সময় লাগলো না। তাড়াতাড়ি কথাবার্তা চুকিয়ে ওঁরা আমাদের বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলেন জায়গাটা কেমন দেখাতে। বাড়িটির চারপাশে ধানক্ষেত। মেয়েটির বাবা আগে ব্যাংকে চাকরি করতেন, অবসর নেয়ার পর তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমিতে ধান চাষে নিয়োজিত, যেমনটি তাঁর বাবা করতেন। জমিটি বেশ বড় হলেও তিনি জানালেন, এখন কৃষি কাজ করে সংসার চালানো কঠিন, কারণ এখনকার যুগে মেশিনে নির্ভর না করে ক্ষেতের কাজ করা সম্ভবপর নয়, আর মেশিন কেনার জন্য নেয়া ঋণ পরিশোধ করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। তবে তিনি এও জানান, বিওয়া হ্রদের কাছ থেকে তিনি সব সময় তৃপ্তি বোধ করেন, কারণ এখানে হ্রদ থেকে চাষের কাজের জন্য যথেষ্ট জলের সুবিধা রয়েছে, বিওয়াকোর উপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের জন্য গরমকালেও তেমন গরম পড়ে না। শীতকালে তুষার পাতের পরিমাণ কম আর সারা বছর ধরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করা যায়। মে মাসে চারা লাগানোর পর এখন

ধানগাছ গুলো বেশ বড় হয়েছে। ধানক্ষেতের ঘ্রাণ নাকে নিয়ে আসে মৃদু বাতাস।

তার পর গাড়ীতে চেপে বিওয়া হ্রদ দেখতে বেরিয়েছি। আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল চিকুবু দ্বীপ। নাগাহামা বন্দর থেকে জাহাজে করে সেখানে যেতে লাগে আধ ঘন্টা।

প্রচুর গাছে আবৃত এই ছোট দ্বীপে রয়েছে বিখ্যাত বেনযাইতেন (সরস্বতী দেবী) এর দেবালয়। এই দেবালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিংবদন্তীতে বলা হয়, ৭২৪ সালে তৎকালীন সম্রাট এক রাতে স্বপ্নে শিন্তো ধর্মের মাহাদেবী আমাতেরাসুর আদেশ পেলেন চিকুবু দ্বীপে সরস্বতীর মন্দির গড়ে তোলার জন্য। সম্রাট তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধ পুরোহিত গিয়োকি কে পাঠান দ্বীপটিতে। গিয়োকি মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি সরস্বতীর মূর্তি বানিয়ে সেখানে স্থাপন করেন। চিকুবু দ্বীপের এই সরস্বতী দেবীকে জাপানের তিনটি প্রখ্যাত সরস্বতীর মধ্যে একটি হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্য দুটি সরস্বতী দেবীর অবস্থান

কানাগাওয়া জেলার এনোশিমা এবং হিরোশিমার ইৎসুকুশিমা মন্দিরে। পুরোহিত গিয়োকি যে মূর্তি খোদাই করে বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়, তা দেখার সুযোগ কিন্তু সচরাচর মেলে না। জনসমক্ষে সেটি দেখানো হয় ৬০ বছরে কেবল একবার। ১৯৭৭ সালে প্রদর্শিত হয়েছিল বলে পরবর্তী সুযোগের জন্যা আরো ৩০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। পরিবর্তে এর কপি রাখা হয়েছে প্রধান দেবালয়ে। অনুমতি নিয়ে দেবালয়ের ভিতরে গিয়ে দেবীকে দেখলাম। প্রথমে লক্ষ্য করলাম, তার হাতে বীণা নেই! আর বাহন হিসাবে রাজহাঁসের পরিবর্তে দেখা গেল নাগ। সরস্বতী দেবীকে যেভাবে চিনি, তার থেকে অনেক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। সম্ভবত: ভারতবর্ষ থেকে চীন ও কোরীয় উপদ্বীপ হয়ে দূর প্রাচ্যের এই দ্বীপ দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দেবীর চেহারার পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে চেহারা যাই হোক না কেন, এই সত্যতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে এই দেবীকে অনেক বছর ধরে জাপানবাসীরা আন্তরিকতার সঙ্গে যত্ন করে পুজো করে এসেছে।

চিকুবু দ্বীপে অবস্থিত অন্য একটি মন্দিরের তোরণ সহ দুটি স্থাপনা জাতীয় ধন- সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত।

চিকুবু দ্বীপের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সামেগাই এলাকায়। বিওয়া হ্রদ থেকে গাড়িতে ১৫ মিনিটের পথ। এই এলাকা মধ্য যুগে কিয়োতো এবং এদো (বর্তমান টোকিও) কে যুক্তকারী এক প্রধান সড়কের অন্যতম যাত্রা বিরতি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

এই এলাকার মাঝখান দিয়ে যে ছোট্ট নদী বয়ে যায়, তার জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। জলের মধ্যে এক ধরণের আগাছা দেখতে পাওয়া যায়। জলের মধ্যেই তার ফুল ফোটে।

এমন কি গরমকালেও জল ঠান্ডা থাকে বলে এখানকার বাসিন্দাদের স্রোতের মধ্যে তরমুজ, শসা ও বিয়ারের বোতল ইত্যাদি ডুবিয়ে রেখে ঠান্ডা করে খাওয়ার অভ্যেস আছে। পুরোনো দিনের যাত্রীরা অনেক পথ হেঁটে অতিক্রম করার পর সামেগাইতে পৌঁছে এই স্বচ্ছ জলের স্রোত দেখে যে বড় স্বস্তি পেত, তা অনায়াসে আন্দাজ করা যায়।

সামেগাই ছেড়ে চলে যাচ্ছি ততক্ষণে সূর্য অস্তগত হল। দেখতে দেখতে বিওয়া হ্রদের রং বদলে যাচ্ছে সোনালী থেকে লালচে বেগুনি, তার পরে ঘন নীলে। হ্রদের ঢেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে আলোর শোভা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রঙের খেলা লক্ষ্য করছিলাম। ভাবতেও পারিনি এক দিন এই হ্রদের কিনারায় দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখবো। মনে মনে ছেলেকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, তোর বিয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের সবাইকে সুখ এনে দেবে ।

আমার টোকিও দর্শন

নির্মলকুমার সিন্‌হা

অনেকদিন ধরে দীপ্যমান ও দেবশ্রীরা বলছে তোমরা একবার জাপানের টোকিওতে ঘুরে যাও। কিন্তু হয়ে আর ওঠে না। কর্মজীবনের কর্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা! তাই অবসরের পর মনে মনে স্থির করলাম এবার টোকিও শহরটাকে দেখে আসবো। আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধবরা শুনে তো হাঁ-হাঁ করে উঠলো। সেকি! টোকিও যাবে কি? ওখানে তো ওরা চিনবে না, কথা বলবে না। তার চেয়ে বরং ইউরোপের দেশগুলোতে যাও। ওখানে দুটো কথা বলতে পারবে, আনন্দ পাবে, ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যে পরস্পরের আদান-প্রদান করতে পারবে। কিন্তু জাপানের টোকিও শহরটার মনে মনে একটা ছবি এঁকে ফেলেছি। ভালবেশে ফেলেছি বলতে গেলে। ঠিক করলাম, নাঃ টোকিওতেই যাব এবার। খুবই রোমাঞ্চকর লাগছিল। নতুন দেশ - নতুন জায়গা দেখবো বলে।

নারিতা এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমেই ধাক্কা খেলাম। বিশাল এয়ারপোর্ট দেখে। কোনকিছু জিজ্ঞাসা করলে কেউই ভালভাবে বলতে পারছে না। ভাষার সমস্যা বিস্তর। আমার বডি-ল্যাংগুয়েজ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম- কোথায় অভিবাসন, শুল্ক দপ্তর, কোথা দিয়েই বা শহরে যাব? হতঃস্মি আমি! যাইহোক, অনেক সমস্যা করে এয়ারপোর্টের বাইরে আসা গেল। একটা ট্রেনও দাঁড়িয়ে ছিল। টিকিট কেটে একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে উঠে পরলাম - 'জয় শ্রীরাম' বলে। ট্রেন ছেড়ে দিল। এবার আমার গন্তব্যস্থল হলো 'শিনাগাওয়া' রেল ষ্টেশন। সেখানে পৌঁছে ষ্টেশনের বাইরে এলাম। এবার ঠিক করলাম-আর নয়-এবার একটা Taxi নিতে হবে। আবার যথাপূর্বক ভাষা সমস্যা। আমার গন্তব্যস্থলের নাম বলে বোঝাতে পারলাম না। শেষে একটু কাগজ ওর হাতে গুঁজে দিলাম। তাতেই ছিল গন্তব্যস্থলের নাম ঠিকানা। ও দেখলাম ট্যাক্সিতে রাখা একটা টিভির মত জিনিসে কি দেখল, তারপরেই 'হাই' বলে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করল। আর আমি মনে মনে দূর্গা নাম জপতে লাগলাম। ভাবলুম এ কোথায় এসে পড়েছি। ঠিক মত বাড়ী খুঁজে পাব তো, না আবার ইউ টার্ণ দিতে হবে এখান থেকে কলকাতার পথে!

না তা হল না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম ড্রাইভার আমার গন্তব্যস্থলে ঠিক নিয়ে এসেছে। পরে জেনেছি ঐ টিভিটা স্যাটেলাইট রোড ম্যাপ। ড্রাইভারের ব্যবহার আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে, যা আমাদের কলকাতায় বিরল। মনে মনে মুগ্ধ হলাম একটা দেশ তার নিজস্ব ভাষা নিয়ে এত উন্নত হতে পারে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বয়স্ক লোকেরা নিজেদের কম্যুনিটি এরিয়াটাকে পরিষ্কার করছে। পরে জানলাম এখানে লোকেরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নিজেদের জায়গা নিজেরাই পরিচ্ছন্ন রাখে। সাজানো গোছানো শহর - লোকেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আরও সুন্দর করে তোলার উদগ্র বাসনা ।

এখানে এসে শুনলাম, টোকিওতে বাঙ্গালীরা দুর্গাপূজা করে মহা ধুমধাম করে। তাই ঠিক করলাম এবার পুজোটা টোকিওতেই কাটিয়ে যাই। কলকাতার পুজো মানেই তো হৈচৈ, হট্টগোল। তাই ভাবলাম টোকিওর শান্ত পরিবেশে দুর্গাপূজা কেমন লাগে দেখেই যাই। অন্তত কলকাতায় গিয়ে বলতে পারব প্রবাসেও বাঙ্গালীরা কেমন দুর্গাপূজা করছে। তবে বাঙ্গালীরা আড্ডাপ্রিয়-ভোজনপ্রিয়। পূজা মানে চারদিন ছুটি - খাওয়া দাওয়া আর চুটিয়ে প্যান্ডেলে আড্ডা মারা। পূজার ক'দিন নিজের বাড়ীতে থেকে আত্মীয়স্বজনদের সাথে আনন্দ উপভোগ করা বাঙ্গালীর পরম্পরা। তাই সকলেরই মন চায় বাড়ীতে থেকে সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করা।

টোকিওতে আর একটা জিনিস খুব ভাল লাগল ট্রেন বা বাস পরিসেবা -ঘড়ির কাঁটা ধরে আসছে যাচ্ছে। সবই যন্ত্রের মত - দম দেওয়া পুতুলের মত চলছে। লোকের মধ্যে কোনও মানসিক চিন্তা নেই - চাপ নেই। অফিস কাছারীতে দেরীতে পৌঁছোনোর বালাই নেই।
তবে আমার কাছে, টোকিও যতই ছিমছাম সাজানো গোছানো হোক না কেন কলকাতা আছে কলকাতাতেই। ভীড়, হৈ-হল্লা, ছোটাছুটি জনারণ্য, গাড়ীর আওয়াজ, লোকেদের ব্যস্ততা ইত্যাদির মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সকালে উঠেই বেশীরভাগ লোকে খবরের কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে থলি হাতে বাজারে যাওয়া। তারপর কোনরকমে খাওয়া দাওয়া করে ছোটো অফিস কাছারীতে। সন্ধ্যেয় বাড়ী ফিরে আড্ডায় মেতে ওঠা -রাজনীতি থেকে সিনেমা, বাঙ্গালীরা জানিনা এমন বিষয় নেই।

আর পূজা পার্বণ-তাতেও বাঙ্গালীরা সবার থেকে এগিয়ে। কোন মহল্লায় ৭-৮টি বাঙ্গালী পরিবার থাকলেই হোল -ওরা এগিয়ে আসবে - সব প্রদেশের লোকদের সঙ্গে নিয়ে পূজা পার্বণ বা কোন অনুষ্টান শুরু করে দেবে। এইভাবেই শুনেছি টোকিওতে বাঙ্গালী এসোসিয়েশন প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেছিল - তা আজও অব্যাহত। শুধু টোকিওতে নয় - পৃথিবীর সারা দেশে যেখানেই বাঙ্গা লী আছে- সেখানেই পূজা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এটা একটা সারা বছরে সবার সাথে মেলার অনুষ্ঠান। তাই এই সবার সাথে মেলা মেশার লোভ আমিও ছাড়তে পারলাম না। থেকেই গেলাম টোকিওতে দুর্গাপুজা দেখব বলে ॥

Shakti and Science

Virendra Shanker

"There is nothing in the world, which is not SHAKTI in its essence". This is what we always believed since ancient times.

In the last century, it was scientifically demonstrated by one of the greatest scientists of our times, Herr Albert Einstein. The visualization of this fact through his profound ideas which may look complicated at first sight are not so in reality. Rather, their greatest beauty is their crystalline simplicity.

One of the effects which he discovered using the physical laws he proposed revealed the relation between mass and energy of a particle. Energy, the power to do work, is also termed as SHAKTI.

As we all know, Einstein's discoveries relate to the basic notions of time and space which are foundation stones of physical laws. This formed the first revolutionary new physical themes developed in the last century and is popularly known as 'Einstein's Theory of Relativity'. These physical laws are quite different from what has been traditionally understood as Newton's law of physics. Thus Einstein's discoveries about time and space imply a new physics. Just to indicate, in a qualitative way, what Einstein's physical laws are like, we will discuss, in short, the relation between mass and energy which he discovered.

Einstein demonstrated that no particle can ever be made to travel faster than speed of light. This must mean that as the speed of a particle approaches the speed of light, it becomes more and more difficult to bring about increments in its speed. That is, the effect of fixed force of acceleration exerted on a particle must become smaller and smaller as the velocity of the particle approaches the velocity of light. Now, the proportionate resistance which a body offers to accelerate is called the mass. Thus he was led to the conclusion:

'The mass of a moving body must increase as its velocity increases and increase without limit as its velocity nears the velocity of light'. Einstein was able to find the precise quantitative expression for this increase in mass of a moving body.

If energy, say in the form of heat, is communicated to a body, then the individual molecular particles constituting the body are caused to move more rapidly. By the principle, just stated, each of these particles, and hence the body as a whole, must be more massive. Thus:

'An increase in the energy of a body must be connected with an increase in its mass'.

Einstein was able to show that the increase in mass must be exactly proportional to the increase in energy and to show that the correct factor of the proportionality is the square of the velocity of the light. This conclusion, expressed in the famous formula:

$$\text{Energy} = \text{Mass} \times (\text{Velocity of Light})^2$$

revealed, in 1905, the tremendous energies locked up in the atomic nucleus. It became the most famous formula of twentieth century.

This formula is not the formula for Atomic Bomb as many of us think. The Atomic bomb project began in 1939. Nuclear Physics was developed by other scientists, like Joliet Curie, Enrico Fermi and Leo Szilard. Szilard in 1934 came up with the idea of the "chain reaction"

release of atomic energy which was basically a practical manifestation of the fact Einstein had proposed, the enormous energy contained in a particle which is invisible otherwise.

Einstein had, at the time of his discovery, just argued that energy has mass (inertia) and mass has energy. The scientific base which he provided for this very fact made him the greatest scientist of 20th century.

Hence, there is a scientific support for what we said in the beginning; there is nothing in the world, which is not SHAKTI in its essence. How true had been our belief is some thing really unique and how it was realized by our saints in their own way is something to ponder upon? We are not wrong in believing that "Shakti" is the Great Mother of the Universe.

The Goddess Maa which symbolizes "Shakti" in our mythology is, thus, the "Supreme power" which saturates the entire of the universe, and from which the Universe has emanated.

The very belief that Maa fights and vanquishes the evil forces to protect her Bhaktas (Devotees) gives tremendous amount of confidence and will- power to individuals. It is very true that she is always on the lookout for ways and means of helping her Devotee. Maa, indeed, is very "Karunamayi", "Kripalu" and "Dayalu" (Kindhearted).

Durga Puja is the time to remember and invoke the omnipresent, the energy, power, Shakti or whatever you may call that is symbolized in Maa Durga or various forms she took from time to time to vanquish the evil. Jai Maa.

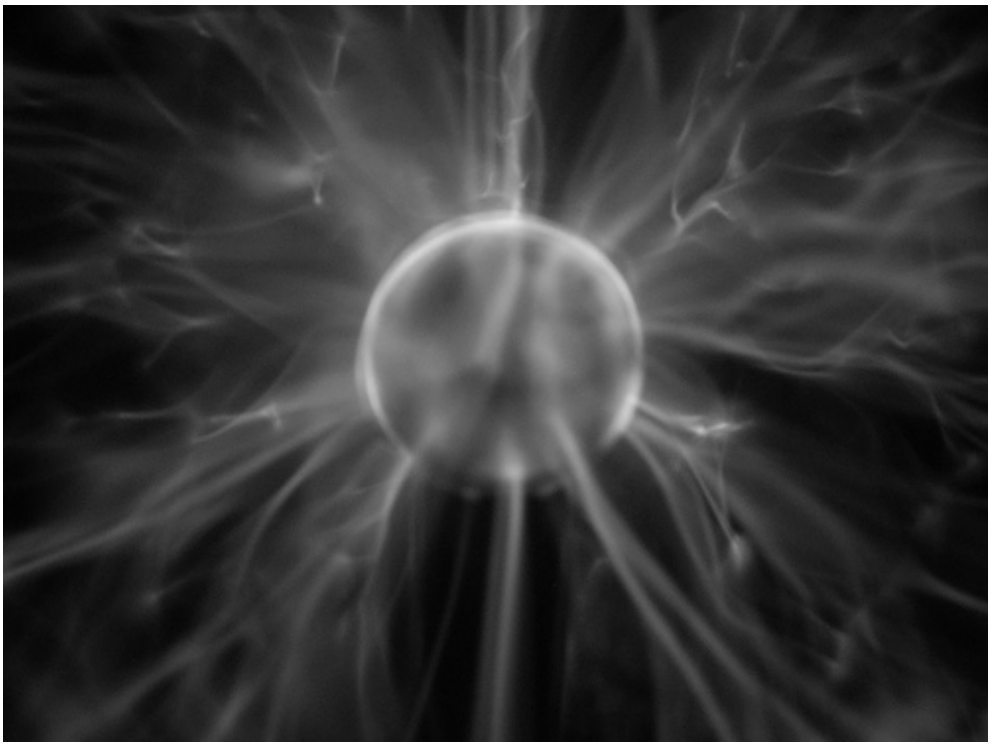

शिव और शक्ति

ईलाशंकर

शक्ति के दो महत्वपूर्ण केन्द्र शिव और शक्ति माने गये हैं। वस्तुतः शिव और शक्ति ब्रह्मांड तथा प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न रूपों में क्रियाशील रहते हैं। मानव समाज में पुरुष और स्त्री क्रमशः शिव और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्वभौमिक चेतना में काल और स्थान, शिव और शक्ति, इन दोंनों पक्षों का विहपण करतें हैं। आध्यात्मिक जीवन में मन तथा प्राण शिव और शक्ति के प्रतिरूप हैं।

ये दोनों शक्तियाँ उर्जा के दो विपरीत ध्रुव हैं। सामान्यतः ये दोनों कभी एक नहीं होतीं, किन्तु सृजन के क्षणों में यह एक बिन्दु पर एक दुसरे में समाहित हो जाती हैं। सार्वभौमिक चेतना में काल और स्थान केन्द्र पर आकर मिलतें हैं और उनका आपस में विनय होता है, तब पदार्थ में विस्फोट होता है। यहाँ काल और स्थान में क्रमशः घनात्मक और ऋजात्मक शक्तियां प्रतिबिम्बित होती हैं।

मानव समाज में पुरुष और स्त्री शक्ति के दो भिन्न ध्रुव हैं। प्राचीन तांत्रिक शास्त्रों में शक्ति के इन ध्रुवों का विस्तृत वर्णन है। महाकाली के चित्रों में शिव ज़मीन पर चित लेटे दिखाई पड़ते हैं और काली का एक पाँव उनके शरीर पर है। मां काली की मुद्रा भयंकर है, रक्तरंजित जिह्वा और गले में एक सौ आठ मुंडो की माला, यह काली का जाग्रत अवस्था है। शिव का एक अन्य दुर्लभ चित्र भी देखनें में आता है, जिसमें वे पद्मासन में बैठे हुए देखे जाते हैं। इसमे उनका आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का है। अर्धनारीनरेश्वर के चित्र में भी आधा शरीर शिव और आधा पार्वती का देखा जाता है। एक अन्य चित्र में शिव को गुरु और पर्वती को शिष्या रूप में दिखाया जाता है। शिव पद्मासन में बैठे हुए हैं तथा पार्वती नीचे वेदी पर आसीन हैं।

विकास तथा जागृति के विभिन्न स्तरों पर शिव तथा शक्ति के ये विभिन्न सम्बन्ध हैं। एक स्थिति में शक्ति शिष्या हैं और शिव गुरु हैं अर्थात स्त्री शिष्या और पुरुष गुरु हैं। दूसरे स्तर पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिव और शक्ति एक दूसरे के संयुक्त हैं। विकास का एक अन्य स्तर है जहाँ शक्ति सर्वोपरि है और शिव उनके अनुयायी है। यह सब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सहज रूप से विद्यमान रहने वाली शक्ति की जाग्रत अवस्थाओं की दार्शनिक व्याख्याएं हैं।

एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है, स्त्री शक्ति की वाहिका रही है। पुरुष महज एक माध्यम है। एक स्त्री केवल हमारी पत्नी ही नहीं होती, वह हमारी माता, पुत्री, शिष्या भी हो सकती है । मरियम इसामसीह की माता थी। श्री अरबिंद आश्रम की माँ एक शिष्या थीं। इसी प्रकार एक परम्परा में चौंसठ योगिनियों की कथा वर्णित है। शाब्दिक दृष्टि से 'योगिनी' योगी का स्त्रीलिंग रूप है। इन योगिनियों की पूजा पूरे भारत में होती है। स्त्री शक्ति के चौंसठ रूपों के लिये चौंसठ मन्दिर हैं, उनमें से एक आसाम में और दूसरा कलकत्ता (कोलकाता) के कालीघाट में स्थित है।

हिन्दुओं के सभी अनुष्ठान, धार्मिक या अन्य मुख्यतः स्त्रियों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं, पुरुष केवल उनका साथ देते है। स्त्री समादेष्टा होती है और पुरुष उसका सहभागी। सामान्य सामाजिक उत्सव हो, धार्मिक उत्सव हो, किसी देवी-देवता की पूजा हो या एकदिवसीय उपवास हो, स्त्री ही सबका कार्यान्वयन करती है। पुरुष केवल उसका साथ देता है।

आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री की भूमिका तो परिभाषित की गई है, किन्तु आधुनिक संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति इससे बहुत भिन्न है। संपूर्ण विश्व में लोग अपने अपराध और पाप से, अपने आप से लड़ रहें हैं। यदि हम स्त्रियों की सम्मानीय आध्य अवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमको अपनी मनोवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन लाना होगा। वस्तुतः सामाजिक संरचना को धार्मिक वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक नया आधार देना होगा, जिसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में स्त्री की भुमिका को अच्छी तरह समझा और स्वीकार किया गया हो। नये समाज के उद्भव के लिये यह परम आवश्यक है।

Win-Win

Pradipta Mullick

(The huge potential of Business alliance in the area of knowledge based Economics)

I had joined a study group on India's knowledge based economy during the beginning of this year, sponsored by GLOCOM (Center for Global Communication, IUJ). The objectives of the group were to explore opportunities in the India's Knowledge Based Economy.

Japan is an Economical and Industrial powerhouse of Asia and World; its need to leverage India is more strategic than a tactical. Japan has a strong domestic economy of its own, and only a fraction of GDP (less than two digits) is dependent on export, contrary to popular belief. However the population of Japan is decreasing rapidly and the economy has faced challenges to find new growth model over last few decades.

The major opportunities are definitely in the Asian growing economies, specially the China and India, both of which are likely to continue their explosive growth next few decades, fuelled by a billion plus population for each with the emerging middle class and an well established government lead globalization program.

Japan has successfully leveraged the cheap manufacturing capacity of the neighboring Asian countries. However there is no established overseas partner for Japan in the area of knowledge-based economies yet.

Need for changing the Japanese business and economic ecosystem would be greater as Japan becomes an aging country with somewhat saturated economy. The natural influence enjoyed by Japan, by its own right in the world, likely to wane – Japan need to look out and seek partnership, most naturally with the BRIC countries, of which India is probably the next choicer after China.

Current volume of trade between Japan and India is miniscule, compared to that with China, by almost a factor of 1:20. Considering the growth potential of Indian economy over next few decades, the potential for increasing the business volume with India is huge. However the growth had been slow, due to lack of information and an acceptable business model. This could benefit mutually, bridging the gap of culture, infrastructure and language.

China has become the factory of Japan and US and possible the whole world and India has become the powerhouse of knowledge-based workers, servicing almost all developed countries.

Indian IT and ITES industries are now well accepted as the global service provider hub and have effective distribution and support network across the world for the same. The focus on science and technological education and availability of English speaking knowledge workers has made this possible and sustainable.

The Large and Mid size corporations US have successfully tapped the knowledge workers of India to expand their bottom line and global effectiveness. The examples are GE, Citigroup, IBM, Anderson, E&Y, PWC, Microsoft, Oracle, Cognizant, Sapient and so on. However Japanese companies have not taken this course so far.

Japanese industries though successful off-shoring their manufacturing to low cost Asian countries, have not been successful in running

effective global or multinational service or knowledge based industries likes of US.

Significant growth for the Japanese companies could come by globalizing the service and knowledge sector, and also the medium and small size (SME) domestic businesses. These sectors have many wonderful technology and products, which ever sees the light of the global market due to language and global distribution logistics barrier.

Our conclusion was, the Japanese Knowledge Based Industry sectors, especially those from small and medium section, can leverage India as a base, to globalize their products and services. The globalization of products and distribution, after sales services could be done in India, to customers around the world leveraging the existing Indian IT and ITES service network. This could be a winner for both sides creating mutual value. We also concluded that the chances for smaller and agile companies are more likely to adjust the cultural differences, than large traditional companies with entrenched practices of way of doing businesses.

The model would be 'Designed in Japan, Enhanced and Distributed by India' for knowledge based products and services.

For an example of this model, lets take the case of any major Japanese banks, which have huge financial assets but are mostly not gone global yet for various past reasons. Currently the same time Indian outsourcing centers are supporting many multinational banks. The Japanese financial industry aspiring to go global, could speed up their global expansion by leveraging Indian processing and servicing centers from both technological and operational point of view, which is already global enabled.

Another case could be the Japanese Media Industry, take the case any major Television or Media Networks. The media networks have wonderful collection of contents, but are mostly in Japanese only and hardly available outside Japanese. Japan does not have a global media giant, likes of CNN or BBC. Leveraging Indian service centers, Japanese media industry could distribute their existing content assets across the world.
The number of small and medium enterprises in Japan, specializing in wonderful technology and products, which has been historically captive suppliers of the large Japanese companies through the *Keiretsu* System. These captive *Keiretsu* companies could expand their customer base to global companies, through the English speaking service and production centers in Indian knowledge bases.

Needless to say, this model would require a smooth trade and commerce infrastructure covering tax, regulatory framework, greater understanding of mutual business practices, bilingual work force – which had been limited so far. It is still far easier for Japanese investors to invest in Indian Stock Market and benefit from the high ROI, than setting Joint Ventures and facing the logistical challenges.

It would require larger scale of exchange of culture, human relations, understanding and development of a mutually acceptable work style. Similar soft infrastructure had been developed between India and western developed Countries over last few hundred years. The time has come for India to look EAST and Japan could be a key partner for that.

(Gratitude: I would like to thank Ando-san, Shoji-san, Sanjeev and the Nichi-In group friends, to develop many of the thoughts of this article. For those interested to discus such topics, you can join *Nichi-in,* an informal exchange group among Japanese, Indian and other nationals, to facilitate greater exchange of information in informal setup).

The Durga Puja – its Symbolism

Abbagani Ramu

In Hinduism there are 33 million Gods because it does not pin point what is GOD. It was mentioned in one of the Upanishads that when a son asked father what is God, the father replies 'the God is like space'. In devotion every thing in creation becomes God. The devotion is ultimate expression of love.

Though there are many Gods in Hinduism, it believes the existence of one God in diverse forms. One can not see the God in formless unless ones sees God in forms. One can see a person but not the empty space behind that person. In our life all our experiences are with names and forms. That is why we give name to identify a person. Life has five aspects Nama and Rupa, Asti, Bhati and Preeti. Nama and Rupa are aspects of Matter. Asti, Bhati, Preeti are aspects of consciousness. Asti is existence, Bhati is knowingness and Preeti is love.

There is a meaning for the names and forms of Gods in Hinduism. The idol or picture of the God conveys a lot of meaning. In Sanskrit, the name, RAMA, means 'radiant myself'. (RA = Radiance MA= my self). That is consciousness present in every one. One can notice most of the pictures and idols depict the God with one leg firmly footed on the ground and the other leg touching the ground and slightly raised in the air. This tells us to balance the materialism and spirituality in our life. The colorful peacock feather on Krishna's head tells us that we may have various responsibilities but still it can be as light as a feather if we are doing our actions with out our attention on the result. The flute in Krishna's hand tells us our body is like a flute, hollow and empty. Ninety eight per cent of our body is empty space. Our lungs, bones, heart, stomach, brain, heart are empty. Every cell is an empty space. This tells one need not be heavy with the ego.

The purpose of symbolism is to give the devotee the grasp of the divinity, divine qualities, and principles of our creation. So let us see what the symbolism of Durga is.

Goddess Durga represents the power of the Supreme Being that preserves moral order and righteousness in the creation. The Sanskrit

word Durga means a fort or a place that is protected and thus difficult to reach. Durga, also called Divine Mother, protects mankind from evil and misery by destroying evil forces such as selfishness, jealousy, prejudice, hatred, anger, and ego.

She usually has eight, or sometimes thirty-two arms, and carries the weapons of almost all the Gods. The trident is a symbol associated with Shiva, and it's three points symbolize the creation, protection and destruction of the universe.

According to a legend, there was a time when all the gods had been kicked out of heaven by the evil demon Mahishasura, who had the form of a buffalo. In desperation, the gods turned to Shiva, who advised all of the gods to concentrate and release their shaktis. These formed into the goddess Durga, the Invincible One. The gods armed her with their weapons and she went off to battle with Mahishasura.

In Her images, Goddess Durga wears red clothes. The red color symbolizes action and the red clothes signify that she is always busy destroying evil and protecting mankind from pain and suffering caused by evil forces.

A tiger symbolizes unlimited power. Durga riding a tiger indicates that she possesses unlimited power and uses it to protect virtue and destroy evil. The sound that emanates from a conch is the sound of the sacred syllable AUM, which is said to be the sound of creation. A conch in one of the Goddess's hands signifies the ultimate victory of virtue over evil and righteousness over unrighteousness.

Other weapons in the hands of Durga such as a mace, sword, disc, arrow, and trident convey the idea that one weapon cannot destroy all different kinds of enemies. Different weapons must be used to fight enemies depending upon the circumstances. For example, selfishness must be destroyed by detachment, jealousy by desirelessness, prejudice by self-knowledge and ego by discrimination or viveka.

When we celebrate Durga puja or Ganesh chaturthi, we bring out GOD in us in to the idol and have festivities for certain period and take the God back in to us. When we sing bhajans and do satsangs, the sound energy is converted in to consciousness and we feel more active and fresh. When we fast during Navaratri once or twice in a year, it helps cleansing our body. One should fast with a lot of water, fruits and fruit juices to cleanse the body. But unfortunately, most of the people end up eating Singhade ki Pakora and fried potatoes in the name of avoiding the cereals like rice and wheat during the fast.

The true nature our self is love, peace and Joy. Other things like desires, fear, jealousy are just the mind stuff. With the knowledge and awareness one can over come these and realize the true nature of one's self.

When we do Durga puja we should understand the meaning of the rituals and get reminded that - the god existing in all of us, is beyond our mind, intellect and ego. The puja should not become just one more ritual for our get-together. It should take us further in to the path of realization of our true self.

With these few thoughts, I extend warm greetings and best wishes for good health, happiness and prosperity to all readers on the happy Occasion of Durga puja in 2007.

Snippets on Buddhism's demise and possibility of revival in the land of its birth!

Viswa Ranjan Ghosh

It is clear from various historical writings that Buddhism was a powerful force in India that shaped India's society and culture from time of the religion's birth (*5th BC*) until the end of the first millennium. As Amartya Sen mentions in *The Argumentative Indian* (p. 17) "Buddhism, the practice of which is now rather sparse in India, was the dominant religion of the country [India] for nearly a thousand years."

For centuries, Buddhism in India was patronaged by the ruling classes. ***Magadh*** Empire (King Bimbisara and his son Ajatasattu); ***Mauryan*** Empire (Emperor Ashoka who spread the message at national and international levels issuing edicts in Pali, Aramaic and Greek languages, and sending his son Mahinda and daughter Sanghmitra far and wide to spread The Great Buddha's message to Sri Lanka, Burma, present day Myanmar, Thailand, Cambodia, present day Kampuchea); the ***Indo-Greek*** king Menander I (Milinda in *Pali*) who saved Buddhism from the Hindu Sunga dynasty; ***Kushan*** king Kanishka I (who convened a Buddhist Council in Kashmir and had the *Prakrit* Mahayana Texts translated into the literary language of *Sanskrit*); ***Gupta*** king Chandragupta II (the so-called Hindu king sponsored both Buddhism and Jainism during his reign); and King Harshavardhana of Kannauj. ***Pala*** period kings (Gopala, Dharmapala, Devapala and Rampala) were the last to uphold the Buddhist traditions in India and also helped to spread it to Tibet.

Another very interesting patronage was extended by the trading classes of those periods. The Buddhhist message of peace offered some protection to the trade routes and traders' caravans from marauding groups. Also, the Buddhist universalistic ethics could more easily forge ties across various clans, tribes and castes (that were gradually fossilizing). [This relationship between Buddhism and trade has been extensively explored by Dr. Romila Thapar, since April 2003, First Holder of the **Kluge Chair** in Countries and Cultures of the South, **Library of Congress**.]

Demise

Although difficult to place an exact year, month or date on which Buddhism ceased to be such a force in the land of its birth, perhaps it will not be too far from the truth to say that the proverbial final nail in the coffin (that ended Buddhism in India) must have been the destruction of one of the greatest centers of Buddhist learnings – **Nalanda Vishvavidyalaya** (***Nalanda*** meaning "**Giver of Knowledge**" in Sanskrit; another legend indicates that the Great Buddha embraced the meaning of "**Insatiable in Giving**").

In *1193* armies of *Bakhtiyar Khilji* ransacked the **Vishvavidyalaya** forcing the few survivors to flee to modern day Tibet. These events paralleled the beginnings of ***Kamakura Period*** (*1192-1338*) in Japan's history.

In the words of Jeffrey E. Garten (former Dean of the Yale School of Management), "The university was an architectural and environmental masterpiece. It had eight separate compounds, 10 temples, meditation halls, classrooms, lakes and parks. It had a nine-story library where monks meticulously copied books and documents so that individual scholars could have their own collections. It had dormitories for students, perhaps a first for an educational institution, housing 10,000 students in the university's heyday and providing accommodations for 2,000 professors. Nalanda was also the most

global university of its time, attracting pupils and scholars from Korea, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persia and Turkey. [*Really Old School* in December 9, 2006, New York Times].

Founded in the 5th Century A.D., the **Vishvavidyalaya** nurtured mainly V*ajrayana or Tantric Buddhism*. Some of the well-known scholars who studied and taught there were Mahayana philosopher Nagarjuna, Mahavira Vardhamana (none other than the founder of another great religion, *Jainism*); Chinese scholar Hsuan Tsan completed his work here on his *Treatise on the Harmony of Teaching*; Dinnaga, the founder of the School of Logic; Dharmapala, the Brahmin scholar; Shilabhadra the Abbot and master of Buddhist scriptures, et. al.

Possible Third Rebirth

The **Vishvavidyalaya**'s revival at the ancient site of Buddhist learning now seems a distinct possibility once again. Our ex-President, Abdul Kalam, (rather President par excellence) took the initiative in 2006. The latest is that Abdul Kalam will be formally appointed the first Visitor of the proposed **Vishvavidyalaya** [*Kalam to join Nalanda University soon*, August 15, 2007, Hindustan Times].

The Ancient Site of Nalanda

Nobel Laureate Amartya Sen is heading a panel that will oversee the establishment of the **Vishvavidyalaya** in the ancient site of Nalanda. A global consortium led by Singapore, supported by Japan and China, with the Bihar Chief Minster (Nitish Kumar) also playing an active role in the project. Japan's Consulate General, Mr. Noro Motoyasu, has been actively pursuing this with Japan earlier promising nearly JPY 13.5 billion (INR 4.50 billion) for this project.

Many eminent personalities and scholars have given this project their due attention. For instance:

> **Jeffrey Garten** (ex-Dean of Yale School of Management) says, "The rebuilt university should strive to be a great intellectual center, as the original Nalanda once was." [*Really Old School* in December 9, 2006, New York Times]
>
> **Shashi Tharoor**, in *Reconstructing Nalanda* [Online edition of India's National Newspaper Sunday, Dec 24, 2006] writes, "Rebuilding Nalanda must be more than an exercise in constructive nostalgia…If we recreate Nalanda, it must be as a university worthy of the name – and we must be a society worthy of a 21st-century Nalanda."
>
> Says **Abdul Kalam**, "The mission of unity of minds is indeed gaining momentum from Bihar, the birthplace of ancient Nalanda."

Perhaps, re-establishing the **Vishvavidyalaya** once again would auger well for the ethical & spiritual revival of a nation that is torn apart along religious and caste lines. Who knows, what would spring forth from this revival. Perhaps, the ***Din-ilahi***, a dream of Emperor Akbar that would lay to rest unwanted schisms between religions.

Easy & Selected Resources (For those who intending to satisfy their curiosities further)

1. Sen, Amartya. *The Argumentative Indian*. Penguin, New York 2005.
2. Tagore, Sumitendra. *Santiniketan: Chena-Achena* (Bengali). Mitra & Ghosh Publishers, Kolkata 2003 (Poush 1410 Bengali Year)
3. *Timeline of Buddhist History.* (http://www.buddhanet.net/e-learning/history/b_chron-txt.htm)
4. Buy Bangla Books Online. "Boi Mela". (http://www.boi-mela.com/Default.asp)
5. Nalanda Digital Library. "Nalanda – The Ancient Seat of Learning." National Institute of Technology, Calicut, India (http://www.nalanda.nitc.ac.in/about/NalandaHeritage.html).
6. Nalanda Open University. "Historical Background." Gandhi Maidan, Bihar, India (http://www.nalandaopenuniversity.com/).
7. Archaeological Survey of India. "The Archaeological Museum – Nalanda." Nalanda, Bihar, India (http://asi.nic.in/asi_museums_nalanda.asp).

পথে চলে যেতে যেতে

শ্রীমতী সীমা ঘোষ (উকীল)

(Buddha Leaving Home স্বর্গীয় শ্রী সারদাচরণ উকিল ১৯৩৭)

জীবনের আশিবছর পেরিয়ে এসেছি, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, স্মরণশক্তি দুর্বল এবং শারীরিক অক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে কোনোরকমে প্রত্যেকটি দিন পার করা, তবু সকলের অনুরোধে কিছু কথা লিখতে বসেছি। এই প্রসঙ্গে আগেও দু-বার অঞ্জলি পত্রিকায় লেখা দিয়েছি- এটি তারই আরেকটি সংযোজন।

অতীতের এক একটা ঘটনা হঠাৎ হঠাৎ মনকে নাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে আমার জন্ম। বাল্যকাল, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে এখন বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছি। বর্তমানের জন্য আমি অচল কিন্তু অতীত আমার কাছে সচল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের জীবনধারা অনেক বদলে দিল, তার সাথে ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা, শ্রী সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান, ৪৬এর হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ এবং তারপর আমাদের স্বাধীনতা লাভ- তখন পূর্ণযৌবন, রক্ত টগ্‌বগ্‌ করছে, মনে হয় যেন ছাড়া পেলেই অনেক অসাধ্যসাধন করে ফেলতে পারি।

অতীতের যে কথা বলার জন্য এই অবতারণা- স্বাধীনতা ঘোষণা হল ভারতবর্ষের রাতদুপুরে, মনে হল পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে না জানি কি একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখব; কিন্তু সবই ফাঁকি- রাতারাতি হিন্দুস্থান ভাগ হয়ে পাকিস্থানের আবির্ভাব, এদিকের লোক ওদিকে, ওদিকের লোক এদিকে- ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও সেই গোলমালের ভেতর আমাকে পড়তে হয়নি তবু প্রত্যেকের জীবনের উপরেই তার প্রভাব পড়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই- স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের অবস্থা উন্নতির দিকে গেল না অবনতির দিকে তা আমি ব্যক্ত করতে চাই না, জনসাধারণ সে কথা বিলক্ষণ জানেন, শুধু এখানে একটা ঘটনার বিবরণ দিই যার সাক্ষী আমি। আমার পিতা স্বর্গীয় শ্রী সারদাচরণ উকিল ১৯২৬ সালে দিল্লীর বুকে তথা সমগ্র উত্তর ভারতে যে চিত্রবিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর তাঁর ছাত্ররা গুরুর কাজ ভালভাবেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পরে সেটা স্বাধীনভারতের শাসনকর্ত্তাদের হাতে চলে যায়। (বর্তমানে বেশ কয়েকটি আর্টস্কুল দিল্লী শহরে তৈরী হয়েছে) এখন আমাদের সেই স্কুলের অধঃপতন ঘটেছে, বাইরের দিকে সাইনবোর্ডটা কারুরই দৃষ্টিগোচর হয় না, স্কুলকে বড় করার জন্য সেই সময় শাসনকর্ত্তারা জমি দিয়েছিলেন। স্কুল বানাবার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা টাকা তুলেছিল। আমরা পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছ থেকেও চাঁদা তুলেছিলাম। স্বর্গীয় শ্রী হারীন চট্টোপাধ্যায় অপুর্ব একটা ইংরেজী নাটক 'কার্ডসেলার' করেছিলেন স্কুল তৈরির টাকা তোলার জন্য।(স্বর্গীয় হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বললে অতুক্তি হবে না। তাঁর অসংখ্য গুণাবলী ভারতবর্ষের লোকের কাছে অজানা নয়। কবিতা রচনা- বাংলা ও ইংরাজীতে, তাছাড়া মুখে মুখে ছড়া কাটা, অভিনয়ের অসাধারণ দক্ষতা ছাড়াও তিনি উঁচুদরের গায়ক ছিলেন। উনি গভর্নর ঁশ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভাই ও পদ্মজা নাইডুর মামা। ওনার স্ত্রী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের কথা তো স্কুলের পাঠ্যে পড়ানো হয়। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা হারীন চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন নিশ্চয়ই।) এই ভাবে বেশ ভাল অর্থ সঞ্চয় হয়েছিল, কিন্তু সেসব অর্থ যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল জানি না। স্কুলের যেমন দীন অবস্থা ছিল এখনো তা বর্তমান। এ রকম ভাবে কত ভাল স্কুল, রঙ্গমঞ্চ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের বয়স বাড়ছে, শিশুরাও বড় হচ্ছে; দিন এগিয়ে চলেছে, ভালোর দিকে না মন্দের দিকে তা সময়ই বলে দেবে।

এর পর আসলো 'হিন্দু-চীন ভাই-ভাই রব'। তারপরই লাগল চীনের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ। সেই সময় জহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেক বাড়ীতে যুদ্ধজয়ের উদ্দীপনা, সন্ধ্যে হলেই ব্ল্যাক আউট। প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যেক বাড়ীতে সেনাদের প্রয়োজনীয় কাপড় জামা মানে তখন প্রচন্ড ঠান্ডা, তাই সেনাদের জন্য উলের মোজা ও হাতের দস্তানা বানাবার আদেশ এলো। আমরা তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে বসবাস করি, আমার ভাসুর মহাশয় স্বর্গীয় অমিয়ভূষণ ঘোষ তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ইকনমিক্সের অধ্যাপক। আমাদের যৌথ পরিবার ছিল তাই আমার বড়জা ও আমার উপর ওই মোজা ও হাতের দস্তানা বানাবার তাগিদ এলো। যে যে ভাবে হোক যুদ্ধের সময় দেশকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, গৃহিনীরাও তাতে বাদ যায় নি।

এর পরের ঘটনা অনেকেরই হয়তো জানা। আমাদের দেশের হাজার রকম চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা তো জনসাধারণের অজানা নয়। খুবই আশা নিয়ে থাকি যে ভারত শান্তি-পুর্ণ দেশ হবে ও জনসাধারণের ভবিষ্যৎ জীবন স্থিতিলাভ করবে- এই এখন আমার একান্ত কামনা-
'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

কবি বলেছেন 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুণী উঠলো রাঙা হয়ে', কিন্তু আমার প্রশ্ন কবি তো এক রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। তাঁর চেতনার অনুভূতি যদি এমনটি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের চেতনার কি রং ? ভাবতে বসে অনেক আজে বাজে কথা মাথায় এলো। মনে হতে লাগলো এই সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা। আমার কথা, আমার চেতনার কথা। ঠিক তাই, যতই ভাবি মানুষের কথা, ঘুরে ফিরে একটি অতি পরিচিত, অতি প্রিয় এবং অত্যন্ত ভালোবাসার একটি মানুষের কথায় মনটা কেমন নড়ে চড়ে বসে- সেই মানুষটি হলো' আমি আর আমার আমিত্ব'। আমিকে কখনো ভোলা যায় না। আচ্ছা আমার চেতনার কি রং ? আমার চেতনার রং এ আকাশ কি রামধনুতে ভরে যায়, আমার চেতনার রংএ কি নদীতে বান আসে? আমার চেতনার রং কি সবুজ না লাল, নাকি সেটা নীল প্রশান্ত সাগরের মতন?

মাঝে মাঝে, মনে হয় আমার চেতনার রং বোধহয় কালো, কুৎসিত, অন্ধকার কালো। আমাদের সবার চেতনার মাঝে বোধহয় অনেকটা কালো রং। আমরা সেই রং এর তুলি দিয়ে একে অপরকে ঘৃণা করি, সেই তুলির আঁচড়ে আমরা হিংসা করি, রাগ করি, একে অপরকে পরিহাস করি।

না, না, এ আমি কি বলছি? আমার চেতনার রং মনে হয় সাদা ; নির্মল, নিষ্পাপ এক নতুন রং এর অপেক্ষায়। আমাদের চেতনা বোধহয় রংহীন সাদা। নতুন রং এ মেশার নেশায় মত্ত। আমাদের চেতনা নতুন রং এর খোঁজ করে চলেছে।, চিৎকার করে বলছে 'আমার ক্যানভাসে তোমরা কিছু আঁকো, রং দিয়ে তাকে ভরিয়ে তোলো। দেখোনা চারিপাশে কত রং। আতঙ্কের রং লাল, মানুষের রক্তের মত লাল। আজ যদি জঙ্গিরা হানা দেয়, অমৃতসরের মন্দিরে আমার চেতনার সাথে সোনার গায়ে লাগবে লাল রং। দেখো আমার চেতনার রং হলুদ, বহ্নিশিখার মতন যত গৃহবধু আজ নিজেকে শেষ করছে কালো রং এর চেতনার কাছে, তাদের চিতায় আজ হলুদ রং। তাই দিয়ে কি আমাদের চেতনা ভরিয়ে তুলবো? নিষ্পাপ, অসহায় দরিদ্রের ছাই হয়ে আসা জ্বলন্ত স্বপ্নগুলো কি মিশে গেলো আমার চেতনায়! অগণিত মানুষ অসহায়, ক্ষিদের জ্বালায় ধূসর হয়ে যাওয়া দেহ, আমার চেতনায় তার রং লাগেনি তো! জানিনা, জানিনা মনের গভীরে আমার চেতনা বলে ওঠে 'ওরে আমার রং সাদা ' আমি জানতাম, আমি জানতাম সে সাদা, সে নিষ্পাপ। 'না' আমার চেতনা বলে ওঠে ' সব রং মিশে গেছে তোর চেতনায়, তাই তো তোর চেতনা সাদা, বরফের মত ঠান্ডা, নিষ্প্রাণ সাদা'। আমার চেতনার রং এ মানুষ হলো মৃতের মত সাদা।

তবে ভয় পেয়োনা, আমি খুঁজে পেয়েছি আর একটা রং। আমি যেদিন বলবো 'বন্ধু আমার চেতনার গায়, মনে হল গেরুয়া রং লেগেছে। বৈরাগীর তানে যেদিন বাজবে তার একতারা, সব কাজের শেষে বাউল মনে দোলা দেবে সন্ধ্যের রং' আমি বলবো ' আমার চেতনার রং এ পৃথিবী হল সবুজ আর আমি হলাম আগুন'।

ঐ যে মানুষটা

রফিকুল ইসলাম

ঐ যে মানুষটা ––
প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে
ওকে আমরা সবাই চিনি।
ওর কোনো অপরাধ ছিল না
অথবা সজ্ঞান অপরাধ-প্রবণতা;
ওকে আমরা সবাই চিনি।

আসলে হাঁটতে হাঁটতে
রোদ্দুরে ও প্রকান্ড একটা
ছাতার নিচে আশ্রয় খুঁজেছিল
ও মনে মনে বিশ্বপরিক্রমায়
সুখ পেতো –
ওর নির্দিষ্ট কোনো বাড়ি ছিল না
ও কিন্তু তীব্রভাবে বেঁচে
থাকতে ভালবাসতো
আমরা সবাই তা জানি।
মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা
ওর যে আজন্ম অধিকার
তবুও তো ওকে মরতে হলো!

উন্মাদ এই পৃথিবীতে
ও অবশ্য বিশ্বাসের
একটা চারাগাছ
জীবন্ত রেখে যেতে পেরেছিল –
ওর কোনো অপরাধ ছিল না
অথবা সজ্ঞান অপরাধ-প্রবণতা ॥

উত্তরের জন্য ছুটি ....

ইমরোজ নাওয়াজ রেজা

তুমি ডেকে গেছো সকালে
আমি বলেছি যাচ্ছি -
সবুজে-নীলে মিশে এ জগৎ
এ আশ্চর্য বেঁচে থাকা
প্রতিদিন
এ জগতে প্রতিদিন আমি ছুটি কাটাই।

কোথাও কি যাবার ছিল আজ?
ভুলে গেছি আমি- তুমিও কি গিয়েছো ভুলে?
এ জীবনে আষ্টে-পৃষ্টে ছুটি ...
ঘামের শরীরে বাতাস স্পর্শ তুমি -
কোথাও যেও না আজ। – এইখানে হাত ছুঁয়ে থাকো।

আমরা জেগেছি ঘাস থেকে ঘাসে -
মাটিতে- পানিতে-আকাশে
চোখের পাতায় দেখেছি তোমার
তারাভরা রাত। খসে পড়া তারা।
নিঝুম আঁধারে পদধ্বণি ওই -
ওকে বলে দেব,
ইতিহাস আর - ক্ষিদের গন্ধ যত।
তুমি ছুঁয়ে থেকো আমাদের ছুটি দিয়ে ॥

The Ultimate Truth

Angelika Sen

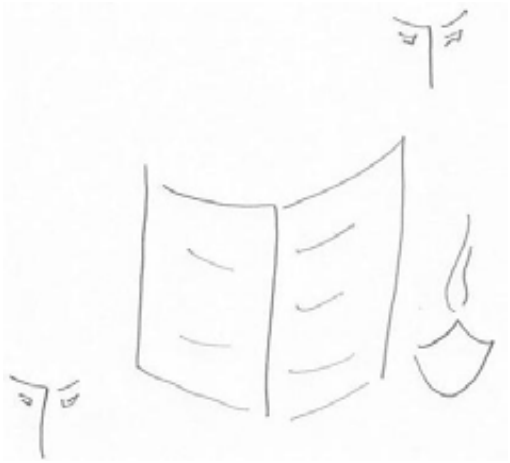

Life- it is but a string of dreams,
Beaded with the essence of change,
Each bead being carefully strung
With memories, ever since life begun.

Childhood- a reminiscence for all
Of teachers, mirth, fights and fall.
To run home into mama's arms
And play with friends in fields and farms.

Gradually one metamorphoses from boy to man,
With leaden shoulders, till one really can.
Working hard through tedious hours
Reality- smiling at all this farce.

But then Adulthood makes one feel like a lark
Weaving dreams from light to dark.
Sweating it out to meet our goals-
Distressed about what the future holds.

Old age is misty- and one looses the past
With sight, taste and memories fading fast.
Preparing us for the ultimate truth- the unalterable journey-
From mortal life to eternity.

Childhood

Dipyaman Sinha

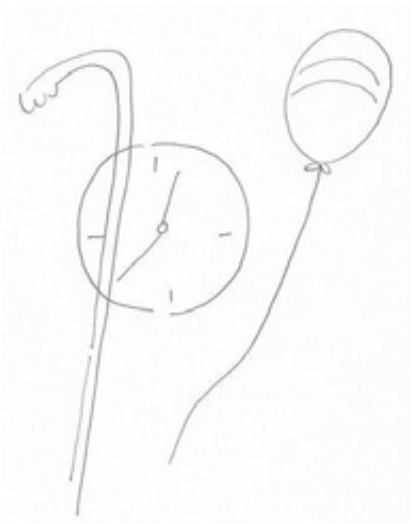

Time flies,
I realize that today…
It was only yesterday,
When I was born.
They cuddled me in their arms,
Their tender touch made me feel
they care.
The day came when
I started to crawl.
They got excited.
They held my hand and
taught me how to walk.
I started going to school.
Every year I passed my exams.
Till finally I realized
that my school life is over.
I blinked my eyes and realized
that it was my childhood,
that I bid goodbye to.

অমৃতের সন্ধানে

নমিতা চন্দ

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল মন
ভয় পেওনা সামনে দেখে নিবিড় ঘন বন;
যতই তুমি এগিয়ে যাবে, নতুন কিছু
দেখতে পাবে
চলার পথে মিলবে তোমার সুগন্ধী চন্দন।
আরও যদি এগিয়ে চল পাবে রূপার খনি
মোচন হবে দঃখ যত হবে তখন ধনী;
রূপার খনি পেয়েও যদি এগিয়ে চল
নিরবধি
পাবে তখন অরূপ শ্যামা মায়ের দর্শন॥

এই তো জীবন!

খগেন্দ্রনাথ জুঁই

এই তো জীবন!
সুদূর সমুদ্রতীরে
অজানা প্রান্তরে
জীবন জীবিকায়
অন্বেষণ পরিক্রমায়
আরোহণ অতঃপর উত্তুঙ্গ চূড়ায় চূড়ায়।

বিশ্বায়নের সুযোগ দেশে দেশে
বারে বারে আসে
বানিজ্যের রসায়নে
কারিগরী চমকে চমকে
নীলাভ আকাশ অংকে
দিগন্ত বিস্তৃত নিত্য সীমানায়
শিশির-সিক্ত ঘাসে ঘাসে।

অর্থলুপ্ত সূক্ষ রীতি নীতি
প্রতিষ্ঠান-ত্বরান্বিত, বিরাট পরিধি-
ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল
ভাষা ভেদাভেদ নেই, স্বার্থ শুধু 'সন্ত্রাসে'
বিবশ
বস্তুচিন্তা নিত্যদিন প্রতিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায়
আরও উজ্জ্বল।

তবু কিন্তু কেন যেন মনের আকূতি,
শেষ হয়ে হয় নাকো ইতি;
শৈশবে, কৈশোরের পর্ণে পর্ণে
আছে যা লুক্কায়িত বর্ণে বর্ণে
জীবনের নরম ছোঁয়ায়
শরতের গৃহকোণ বৎসরের বিহ্বল
নির্দিষ্ট চারদিক
বিত্তবৃত্তে মন নাহি টানে!!

স্বপরিষদ অসুরদলিনী 'মা' নিস্পলক
চেয়ে থাকে
একান্ত মমতায়
বুঝি তাই প্রিয়জন পানে!!!

জাপানে এসে

সুপর্ণা বোস

আসার আগে
ভাবনা ছিল
অজানা দেশ
ভাষার ফারাক
তবুও জাপানে এসেই গেলাম ।

এসে দেখি
একই রকম
বিশ্বায়নের
বড়ই সুফল
ভেবে চিনতে রয়েই গেলাম ॥

বাস-ট্রেন আছে
সাবওয়ে আছে
ঝাঁ-চকচক
দোকান আছে
ক্যামেরা-টিভির রকম হাজার ।

মুসুরির ডাল
সর্ষের তেল
রুই-পাবদা
ট্যাংরার ঢের
ভেতো বাঙালির ফেভারিট আহার ।

দাম জিনিসের
বড্ড বেশি
তবু তারও
জবাব পেলাম
এক-শ ইয়েন দোকান আহা !

কেবলই যাই
ছুতো করে
ফিরি ঝোলা
ভর্তি করে
ঘটি-বাটি-ছাঁকনি-পাখা ॥

ঘুরে বেড়ানোর
জায়গা প্রচুর
প্রকৃতির শোভা
বড়ই মধুর
শীত-হেমন্ত-গরম-বর্ষা ।

আছে পরিবার
BAT-Japan এর
পূজো- মিশন
রবি ঠাকুর
বাঙালির এই কয়টি ভরসা ॥

गीत नया

चन्द्रिका जोशी

मन मेरे कह गीत नया.....
पायल कि सी खनक लिए,
कुछ महक लिए कस्तूरी की।
वर्षा कि चंचल मादकता,
कुछ हो मेघों सी आतुरता।
मन मेरे कह गीत नया....
हर दिन का नया रंग देखा,
चेहरों पर देखे कितने चेहरे।
वैभव की गहन उदासी में,
कितने एकाकी मन देखे।
मन मेरे कह गीत नया....
लौट चला चल अब घर को,
कुछ साथ प्रीत के ले बन्धन।
पर न भूलना बिरहा की इस,
करुण तान की स्वर लहरी।
मन मेरे कह गीत नया....
रैन आज की बस अब तो,
कल भोर नई मतवाली है।
आल्हादित है, कुछ कम्पित मन,
ह्रदय धीर अति आकुल है।
मन मेरे कह गीत नया....
सुन धड़कन की इस लय को,
यह राग कौन सा नया-नया।
हैं छन्द नए, हैं बन्ध नए,
है ताल नई, स्वर नया-नया।
अब तो कह रे मन, इक गीत नया।

आहट शरद की

वायला सिंह

कहते हैं वो कि आ गया है शरद
दबे पाँव हौले हौले छा रहा है शरद।

भोर का सूरज भी उठने में करता है आलस
शाम को जल्दी लौटने का भी करता है साहस।

फ़िज़ा में है मन को लुभाती मदहोशी
भर देती है तन मन में एक नई स्फूर्ति।

कीट मकौड़ो में भी है आहट शरद की,
फूल पत्तीयों में भी चमक है शरद की,

आसमां का रंग भी है बदला हुआ सा,
सूरज की रोशनी में है निखरा हुआ सा।

दिन ब दिन कोमल अहसास इस ऋतु का,
होता है रोज़ आभास इस ऋतु का।

एक अटूट बंधन में बंधे है शरद और दुर्गा पूजा,
वतन से दूर परदेस में भी इस त्यौहार जैसा नही कोई दूजा।

अपने को मिटाना सीखो

सुरेश ऋतुपर्ण

बह जाता है सब पानी की तरह
झर जाता है सब पत्तियों की तरह
उड़ जाता है सब गंध बन
बरस जाता है सब मेघों की तरह

उगता है सूरज
ढलता है सूरज
उमगता है चाँद
टूटते हैं सितारे
खिलते हैं फूल
झरती हैं पत्तियाँ
उड़ते हैं परिन्दे
टिमटिमाते हैं जुगनू
काँटों की नौंक पर
ओस झिलमिलाती है
शोख चंचल लहर
आती है जाती है
हवा डोलती है
यहाँ से वहाँ हरदम

बताओ कौन है सृष्टि में
ऐसा निष्क्रिय और चुप
जैसे कि तुम हो
गुमसुम बैठे हो
रखे हाथ पर हाथ
अहंकार में डूबते-उतरते
अपनी क्षुद्रता में लीन
टिकाए हो हथेली पर माथा

उठो और बहना सीखो
खिलो और झरना सीखो
प्रकृति के पास जाओ
उसकी तरह प्रफुल्ल मन
जीना और मरना सीखो

सौन्दर्य जीने में नहीं
मरने में है।
अपने को मिटाना सीखो।

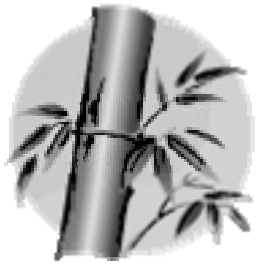

एक दिन

सुरेश ऋतुपर्ण

बँधी मुट्ठी से
रेत की तरह
झर जाएँगे हम एक दिन

रूपहले कणों में झिलमिलाते
याद आएँगे बहुत
मगर हम एक दिन

उड़ेंगे ऊपर आसमान में
पतंग की तरह
रंगों के पूरे उठान के साथ
उम्र कि सादी डोर पर
वक्त का तेज मांझा
चलाएगा अपना पेच
हिचकोले खाते गिर जाएँगे हम एक दिन

हवाओं की लहरों पर
थिरकती कंदील की है क्या बिसात
बरसा कर झिलमिलाते रंगों की लड़ियाँ
बुझ जाएँगे हम एक दिन

घाटी में खिलखिलाते
दौड़ लगाएँगे बच्चों की तरह
और बिखेर कर खुशबू
फूलों की तरह
झर जाएँगे हम एक दिन

धरती की छाती फोड़कर
उगेंगे फिर एक दिन
पकेंगे धूप की आग पर
हँसिए की तेज धार से
झूमते-झूमते कटेंगे हम एक दिन

सूखेंगे, पिसेंगे, गूंथेंगे
चूड़ियों भरे हाथों से
सिकेंगे उपलों की आग पर
और बुझाएँगे पेट की आग हम एक दिन

बरसेंगे उधर हिमालय की चोटियों पर
बर्फ बन जम जाएँगे
सूरज की किरणें भेदेंगी मर्म भीतर तक
आँख से बहते आँसू की तरह
पिघल जाएँगे हम एक दिन

आकाश की ऊँचाई नापते
परिन्दे के टूटे पंख की तरह
अपनी नश्वरता में तिरते
अमर हो जाएँगे हम एक दिन ।

बँधी मुट्ठी से
रेत की तरह
झर जाएँगे हम एक दिन ।

Embarrassments of Forgetting

Sougata Mallik

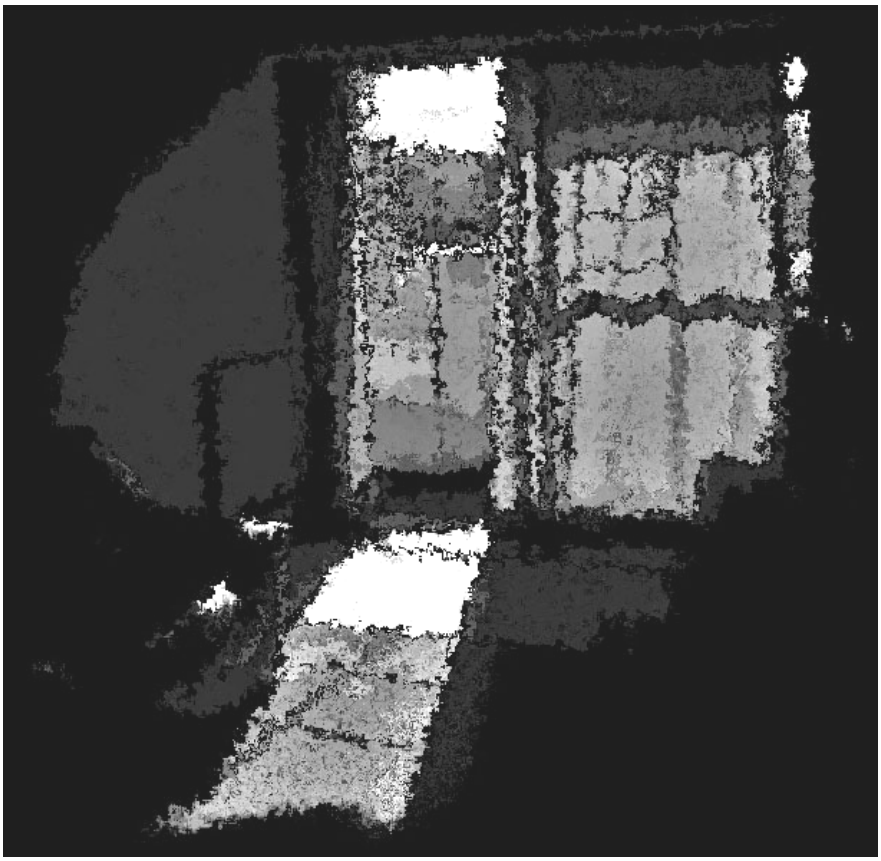

I forget, you forget and they forget. Each one of us forget something, somewhere, sometime or the other. It shows that we are human after all.

My father had forgotten to tell my mother that he had invited two friends to dinner. Imagine the indoor scene when around 9:15 on a cold, winter night the door bell rang, announcing that my father had forgotten something important that day. Thanks to the pressure cooker then, that just a goat meat curry and rice could be placed on the table in about forty-five minutes.

My friend forgot something important. It was her first opportunity in her married life to show her versatility to her mother-in-law. An MA in Philosophy, a non acclaimed wonderful painter, a singer - she was all set to prove that she was also a good cook. She decided on the right pieces of 'Gangar ilish' (hilsa fish), took the right amount of mustard paste, oil, green and red chilies. Mixing all carefully in a strip of banana leaf, she slipped them one by one, into a large pot full of steaming water. It was being meticulously arranged for a sumptuous lunch. She only forgot the rice!

Dr. Sinha too had forgotten something. We all saw the aged professor rush out of class, his handkerchief covering his mouth. As we had been informed that he was going to discuss Metaphysical Poetry that day, the class was

full. His voice boomed in the usual magnitude, "My dear students…" Abrupt silence! Dr. Sinha froze. Too late - he remembered having left his two front dentures at home.

At the age of twenty-two, Mejda - my cousin brother wed a wonderful girl whom everyone lovingly called 'bourani'. On the fifth day after the ceremony, Mejda and Bourani left for Bombay, his workplace. Mejda, then a fresh young engineer, was given a strict nine days leave only to complete this great event of his life. He hurried back to his daily routine - too soon perhaps. It was drizzling and they had to reach home, seven kilometers away, before the Bombay downpour began. Mejda stopped at a petrol station and Bourani stepped down from the bike. Once the petrol was filled, my good natured cousin mounted his bike and was off leaving his nine-day-old bride behind. Terrifying thoughts flashed though Bourani's mind. It had been an arranged marriage. She hardly knew him! Mejda's bike roared back. After twenty-two years and three months' bachelorhood he had momentarily forgotten that there was a wife he had to take back home with him.

Well, if forgetting is a sign of civilized humanity, I am supremely human. I forget both places and faces. I blame untimely advancement of senility. But I also realize that these have nothing to do with age or else I would not have lost my way inside the University of Calcutta when I was a student. The ground-floor of Darbhanga Building with its rooms, cubicles, corridors, nooks and corners used to cause innumerable problems. I remember getting lost in the maze while trying to come out and ending up in front of a room full of dusty unused chairs and tables and getting shooed out by an indignant man - the office peon with a fierce bushy moustache. I panicked and blindly took a turn and found myself facing another dingy room stacked with old papers ----- *"Apni ki poth hariyechen?" (Have you lost your way?)* A feeble version of 'Kapalkundala' was there before me! I was more than grateful to the little cafeteria helper boy for guiding me out and for not asking me what I had been doing there.

After places, I forget faces and I do not know why.

I had met them few months back - Mr. Tapan Mitra and his wife, Sharmila. I thought I had never forgotten. During a function held here recently, I saw my husband and another person talking to each other. I seemed to recognize him. With usual courtesy and greetings, I said: *"Namaskar",* and continued, *"Kemon achen? Sharmila bhalo ache to?" (How are you? Is Sharmila okay?)* My friend standing next to me stopped stirring her tea. My husband sighed. Uncharacteristically calm, he lowered his voice and said: "Wrong number once again. This is Mr. L. Narayanan and he does not understand a single syllable of Bengali."

Are the Japanese and the Bengalis Related?

Nandini Basu

" There comes Mrs. Chakroborty," said my husband. I saw a very elegant Japanese lady with gold-rimmed spectacles enter the train. On closer look I realized that she could pass off as a Mrs.Chakroborty in skirts! Later, I observed that a good number of middle-aged Japanese ladies did share similar looks with their Bengali counterparts and also, like them (and in a very un Japanese way) their conversations are extremely animated. Even Japanese men have a physical similarity to many Bengali men. They are, like our Bengali men, very cautious about experimenting with fashion. In fact when my husband was told, before coming to Japan on his posting, that white shirt and black trousers was the "dress code" in Japan, he happily added a few more white shirts to his closet.

During my initial days in Japan, I found that the tone of many train announcements sounded very much like those in Sealdah station (though the stations looked like those in outer space!). In fact I used to wonder why a Mr. Sen's name was being announced, so often at the stations until I picked up enough Japanese to know that "sen' means "line." I also realized that many words used in Bengali were also part of the Japanese vocabulary, though with completely different connotations. So tomari, basha, desh, are words we often hear in a Japanese conversation. Like the Japanese, the Bengali staple diet is "maachh bhaat"- no wonder that we take to the Japanese cuisine so easily! Infact traditional Bengali cooking is very light too!

The Japanese people are completely secular in the true sense of the term. I would not be bragging to say that most Bengalis have made religion a private affair too. The Durga Puja is more of a social, rather than a religious gathering, where everyone is welcome. In Kolkata, a close Muslim friend of ours was a member of one of the biggest Puja committees.

Looking at these similarities I wonder, "are the Japanese and the Bengalis related? If so, I hope that this only means that Bengal too has a future!

Pujas – near & distant

Arijit Basu

Durga Puja for all is a festival of joy and love. However, there are myriad ways in which the festival is celebrated and enjoyed. In Kolkata, epicenter of this autumn revelry, there are many who would invariably have booked their exotic holiday destinations and quit the city before the 'suffocating' crowds take over – the "Bengali" travel season is on and the ubiquitous Kundu & Banerjee specials would have taken over places as distant as Manali and Kanyakumari! There are others who cannot imagine deserting the city at this time and would never dream of exchanging the nightlong pandal hopping, bhog at the 'para' puja, the new clothes and fashion and the feeling of just being there.

I have been brought up in Calcutta and during my schooldays in the 70s, have happily, year after year, been part of the city during the five wonderful days. It was the time, which transformed the life of a schoolchild – a new Feluda novel, a new Shonku, trying to outdo friends in visiting the most number of pandals, intriguing images made of just about anything from the graceful shola to wax to matchsticks, new Puja songs, great food and above all a time when the mind was 'free'. This was the second most awaited event in the calendar (it would have to be rated a notch below the IFA league soccer encounter between East Bengal and Mohun Bagan during a period when television had not destroyed the fun of the Calcutta Football League by showing Maradona and Zico live). Pujas even allowed you to make friends with a Mohun Bagan supporter!

As time has moved on, in the subsequent years it has not always been possible to be in Calcutta during these magical days and Pujas have been spent in places as far apart as Agartala and London and covering Delhi, Hyderabad, Bombay and now Tokyo. How has it been? Well, they were very different but each, in its own way, wonderful. In Agartala one had the same surging crowds, almost a mini replica of Calcutta, perhaps a little more chaotic. In Bombay, where one has spent five pujas, the celebrations ranged from the more established at Shivaji Park, the up-market corporate patronized pandal at Kemps Corner to the Bollywood extravaganza at Lokhandwala where on Navami night the crowds outdid Calcutta. In Bombay as in Delhi and Hyderabad, the celebrations centre, apart from the Puja and bhog, on Calcutta based cultural troupes and of course, something without which Durga Puja is unthinkable, the quintessentially Bengali passion for food.

The London Puja, eighteen years ago, was an intriguing and interesting experience – one surfaced from the Northern Line Underground at Belsize Park to the clatter of heels on an immaculate pavement leading to a Gothic Town Hall, the inside of which had been magically transformed into the Puja premises with crowds surging to ensure that their Anjali flowers reached the feet of the Mother. I had the temerity to suggest to an old-time Indian resident in UK that this must be the biggest Puja outside India, only to be disdainfully rebuked by the information that this was not a patch on the Manchester Puja that he patronized! Last year, in the first week of getting used to the graces of the Edo-period in a new land as enchanting as it is different; it was time to enjoy the Pujas in Tokyo- a Puja that has to be the most carefully organized and aesthetically correct as the land in which it is celebrated.

Durga Puja outside India is, to borrow a cricketing analogy, compelled to be compressed into a one-day festival from the conventional five-day affair. One common thread, however, binds each and every celebration in any part of the world – a feeling of fulfillment and nostalgia as time comes to wind up the festivities in one year and eagerly wait for the next.

子 育 て の 行 方

山田 さくら

私は今保育園に勤めているのだが、子育ての環境は急速に悪化の一途をたどり、子供を育てる上での大切なものがどんどん失われているという厳しい現実を日々目の当たりにしている。それに比例するかのように未満児（0～2 歳児）保育の需要が伸び、保育園が子育ての重要な役割を果たすようになってきているのだが…

そんな日本の子育ての現実を見るにつけ、2001 年まで 10 年間暮らしていたインドの一般的な子育てのあり方を思い返すことが多くなってきた。

＊　　＊　　＊

インドのシャンティニケタンに住んでいた頃、その時住んでいた家が狭かったため、手ごろな広さの家を探していた。ある日、良い家があるというので夫と二人でその家を見せてもらっての帰り道、インド人の友人宅に寄った。家はどうだったか、とその友人が尋ねたので「子供たちにも見せてから決めようと思う・・」と答えると、納得できないというような顔をして私たちを見つめているのだ。当時息子たちは小6と小 3 だったように思う。

すると、その友人は「子供たちも同意した上で決めるというのは、たぶん良いことなのかもしれない・・でも私たちインド人にはとても奇妙に思える」と言うのだ。「子供は、大きな問題を決めるというセンスをまだ持っていない。だからインドでは子供たちは親の決めたことに従うだけである。子供に相談を持ちかけることは決してない。これはこの国の伝統かもしれないが・・」

それを聞いた時、私たちは頭をガーンと殴られたような気がしたものだ。本当に友人の言うとおりである。相談を持ちかける内容や子供の年齢にもよるだろうが、親がしっかりとその辺を見極めていかないと、年端のいかない子供に大きな負担を強いることになりかねない。親の権威ではなく、親の責任において決定しなければならない問題を子供にも分担させようとする責任の回避を友人に見抜かれてしまったに違いない。そして、親の子に対する真の責任とは一体何なのか？その問題をも突きつけられた気がしたのだった。

とにかく、私が見たインドの親たちは、子育てに心魂傾け全力を注いでいるように見えた。日本人の目から見ると、子供たちの身の回りのことに手を出し過ぎるのではないか思えるくらい世話を焼く。健康管理にはかなり気を遣い、最低小学校に上がるまで、いや上がってからもしばらくは至れり尽くせりの子育てが続いていた。手取り足取り面倒をみるのである。おそらく営々と続いてきたインドの子育てのあり方であり、親の子に対する「愛」以外の何ものでもないのだろう。日本では、死語となりつつある「慈しみ育んでいく」子育ての有りようを見せてもらった気がする。

保育園での集団生活やマスメディアなどによる情報で、基本的生活習慣（食事・排泄・着脱など）の自立を子供たちは小さいうちから急きたてられ、子供たちよりもまず、自分たちの生活を守るのに必死になっているこの国の大半の親たち。置いてきぼりを食った子供たちは一体どこへ行けばいいのだろう？満たされない飢えた心を抱えたまま右往左往している子供たちの行き着く先は、一体どこにあるのか？

子供は幼ければ幼いほど母親を求めて已まない。子供が遊びに夢中になってそれに飽き、母親を呼んで求めると必ず母親が応じてくれる。甘えたい時は、いつでも甘えさせてもらえる。そこに大きな安心感が生まれ、親と子の絆・・愛情や信頼関係が育ち始める。

子供が求めてきたら、抱っこだっておんぶだって、何だってやってあげればいい。子供の心の充足感がどんなに大切なことか ！ 幼ければ幼いほど、親は子供の心のよりどころである。まず親が子供を愛さなかったら、子供たちはどのようにして本当の愛を知るだろう？

だからこそ、親は子供の誕生のその瞬間から、本当の意味での自立までの全責任を負うべき義務があるはずなのだ。

＊　　＊　　＊

息子たちが通っていたシャンティニケタンの学校は、「木の下で授業」をするというのがこの学校の創始者から受け継がれている教育の基本理念の一つだっ

た。一時間目の国語はあの木の下、二時間目の算数はこの木の下…というふうに全科目それぞれ決まった木の下への移動教室になる。戸外での授業だから、授業中には周りでいろいろな展開、ハプニングがある。花や木の葉がノートの上に落ちてきたり、鳥の糞が落ちてきたり…、すぐ近くを牛・ヤギ・野良犬が通って行ったりする。リスたちの運動会が始まったり、時にはハヌマーンと呼ばれている大きなサルの集団が遊びに来たりする。トカゲがカバンに入った、蟻に刺された…などなど日常茶飯事のできごとだった。

このシャンティニケタンだけではなく、インドでは人間と動物の生活が密着している。当たり前のように歩き回っている牛やヤギ。道をのそのそと横切る牛たちを人も車もただ待つ、道のど真ん中でドカッと居すわって動かない牛を避けるだけ、それらは当たり前のように行われていた。重要な働き手である牛・馬・らば・ろば。ある州へ行けば、ゾウやラクダもまた然りだったりする。サルも身近だ。うっかり家の窓や戸を開けておくと必ず何か食べ物を盗んだりいたずらをしたりする油断も隙もない隣人だった。

身近に動物がいるということは、人間は人間だけで生きているのではないということを肌で感じさせてくれる。そして人間はまさに家畜と共存しながら生活を成り立たせている。車や機械とは全く違うつき合い方がそこにはあるに違いない。

ハンディキャップのある人、ものもらい、世捨て人、路上生活者などなどインドでは、彼らもまた身近な存在だ。彼らが救いを求めてきた時、目の前にいる時、どのように対応しどのようにつき合えばいいのか、そういったことを学ばされ、自分の心を見るチャンスと人を助けるチャンスが与えられる。人を助けるチャンスを持てるということは、取りも直さず自分自身を救うことに他ならない。

そのような人たちからも、動物たちからもそして虫たちからさえも隔離された国は異常であると同時に不幸でもある。学校の勉強だけではなく、子供たちが学んでいける環境を自らの手で失くしてしまったのだから。子供たちが体得していける自然環境をも…。

＊　　＊　　＊

二十年前、大量エネルギー消費社会、原子力発電所の乱立、食物汚染や果てしなく続く自然破壊などを目の当たりにし、危機感を感じながら過ごす日々だった。自分の子供たちを始め次代の子供たちのために母親たちが手を取り合って草の根的な運動をしていたこともあった。ところが今やどうだろう？逼迫した地球温暖化、原発事故、地震、異常気象、子育てすらままならない親たち…などなど、そしてさらに悪いことには憲法 9 条の改憲の動きさえ出てきている。二十年前と比べものにならないほど、次代を担うこの国の子供たちの環境は悪化の一途をたどっている。人間の愚かさの極限に立たされているのかもしれない。

次代の子供たちのために、私たちの取るべき道は一体何なのか？大急ぎで考えなければいけない時期に来ている。悪くなるに任せるか、ほんの少しでも良くなる方向へと努力をするか、選ばなければならない。

一日の始まり、そして終わり

平和で静かな美しい一瞬(とき)がある
この宇宙の終わりもまた
そんな一瞬(とき)があるのだろうか

この宇宙の　一日が終わる前に
正法(ダルマ)をとりもどす
準備はあるだろうか
全精力を尽くして

再び宇宙の始まる一瞬のために
目覚め　立ち上がり
希望の種をとっておこう　そして
その一瞬を　待ち続けよう

『あらゆる魂は完全になるように運命づけられており、あらゆる生き物は、ついには完全な状態になります。われわれが今あるところの状態は、過去におけるわれわれの行為と思いの結果であり、われわれの未来の状態は、われわれが今、思ったり言ったりすることの結果である』これはインドの聖者、ヴィヴェカーナンダの言葉だが、この言葉を信ずるなら、希望を友として歩き続けるだけである。次代を担う人たちのためにも。

The Japanese Local Food “Kyodoryori”

Miki Sarkar

ライタやドサ＆ラッサムは、南インド料理。カッシュンバやナンは、北インド料理。ベンガリ料理と言えば、マチェル＆ジョールとバジィでしょうか。

私が生まれる前から日本にいらっしゃる方、または日本に来てまだ1ヶ月も経っていない方、幾つのどんな日本料理を試してみたのでしょうか。勿論今年もAnjali magazineには、私の故郷『青森』について、エピソード4。今回は、レストランでは決して味わえない料理『郷土料理』。自分が生まれ育った地の物で、その季節の旬の物を料理し、食する。それが自然なことで、身体にも、地球にも優しい料理。（早朝、母が歩いて畑に行き、手摘みし、籠に入ったままのキュウリをまな板に取り出すのですから。）またそれは、私にとっての『母の味』。そんな『郷土料理』のお話をします。

お品書き（Today’s Menu）

一品目　胡瓜と鯖蒲焼の和え物　(Dressing cucumber and gilled mackerel in soy sauce)

二品目　烏賊の煮付け　(Boiled squid with soy sauce)

三品目　煮しめと赤飯　(Simple vegetables stew and sweet beans rice)

四品目　つつけ　(Boiled buckwheat and plain wheat sheet noodle with garlic miso)

果　物　西瓜　(Watermelon)

＜胡瓜と鯖蒲焼の和え物＞

今年の夏、青森も大変暑かったので、食卓に2度程あがったのが、これです。胡瓜のみずみずしさと脂ののった鯖と相性のいいお料理です。スライサー薄切りし、軽く塩もみした胡瓜とほぐした鯖の蒲焼を和え、お醤油を一回りかけて出来上がりです。薄味でさっぱりしているので一度食べたら、止まらない。胡瓜をたくさんモリモリ食べられます。

時間が経つと胡瓜の味が変わってしまうので、朝作ったら大抵は、その日の内に食べ切る様に、「かねど？（食べない？食べなよ。）」と母に勧められつつ、今年は、たくさん食べて満足した（満腹な）思い出となりました。

＜烏賊の煮付け＞

これもまた材料も調理も簡単な一品です。写真には3杯しか写っていませんが、生醤油：50ccと味醂：30ccと日本酒：15ccの調味料を全てお鍋に入れ、腸と骨を抜いたイカ10杯を入れ絡め、返しながら、ふっくらと煮えたら出来上がりのお料理です。本来なら、お盆にお魚／お肉類は、ご法度なのでしょうが、そこは時代と共に変わりつつ、八戸港で水揚げされるイカは、実家の行事料理の定番の一つです。他には海老の天婦羅、鳥の唐揚げ、タラバガニのボイルも、最近の定番メニューです。魚＆お肉満載です！このイカの煮付けは、祖母や曾祖母と共に過ごしたお盆の食卓に、ず～っと、ず～っと上ってきた料理です。数年前に一度作ろうとして、イカの腸を取らずにそのまま鍋に入れようとして（入れて？！）母が「なんど～！（何してんの！）」と、悲鳴をあげられてから、なるべく避けています。いつかは、作ってみたいスパイスをマリネードしたイカ焼き。食べてくれるでしょうか！？

＜煮しめと赤飯＞

煮しめの食材は、右上の細長いのが筍。時計回りに、ぜんまい、わらび、焼き豆腐、にんじん、ごぼう、しいたけ、じゃがいも、ふき。お盆と言えば、『煮しめ』。またお正月や地域のお祭りなど、何か特別な行事のある時は、必ず『煮しめ』なのです！お出汁は、煮干と昆布で取ります。ふきとわらびとぜんまいは、春に取れた山菜を塩漬けにしておいた物を塩抜きして使います。これをお盆中2日間かけて食します。味付けは、醤油と酒と砂糖だけ。それも素材の

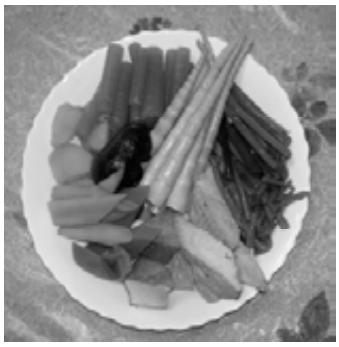

味を残した位が、鉄則です。見て分かるように、一切お肉と魚介類は入っていません。本来なら出汁も昆布だけで取るようです。正直私は、箸が出ません。父や母、祖父は、「めー、めー！（旨い、旨い！）」と言いながら食べます。子供の頃から、このパンチのない味をどうしても、美味しい！と感じる事が出来なく、『この味が分かる時が、必ずやって来る。その時が大人なんだ･･･！？』と子供の頃から思っていたのですが、未だにその時は、遣って来ません。それでも美味しく食べる（フリ）時に欠かせないのが、甘い赤飯なのです。

甘い小豆入りのご飯です。もち米と白米を5:5で炊きます。以前は、小豆をお砂糖で煮たものを使っていましたが、母は粒小豆あんの缶詰を使います。実は赤飯は、甘くないのもだと知った時は、麦茶も甘くないものだと知った時に次ぐショックを受けました。それは、『期待しても得られない淋しさ』の様なものでした。こちらに暮らしていて、お赤飯は、食べた事がありません。食べていて淋しくなるのですら･･･。

＜つつけ＞

お盆中には、食卓にあがらなかったのですが、『何くってど？（何食べたい？）』って言われて、お盆過ぎにやっぱり涼しくなったら食べたくなった、『つつけ』をリクエストしました。こちらは、スーパーで買ってきたもの。家庭でも作れます。3mmほどの厚さの麦と蕎麦の生地を三角形に切ったもの。昆布出しの鍋で湯がき、にんにく味噌をつけて食べます。父に、「はぁ、えがべ！（もう、いいだろう！）」と、急かされながら茹でられて上に浮いてきた『つつけ』をお皿にすくってあげるのです。もし『わんこ蕎麦の』の様に、『つつけ』どの位食べられるかを競う大会があったら、父を出場させます！『麦つつけ』:100枚食べられます！一緒に大根や豆腐も同じ様にして、食べたりもします。今回は、『つつけ』だけでした。別名『かっけ』とも言います。他の小麦粉／そば粉／米粉など粉物の料理も挙げると、串モチ、あずぎばっと、ひっつみ、なべっこだんご、干しもち、きんかもちなどがあります。もちろん全て、自宅で粉を捏ねるところから作り始めるのです。私、どれも大好きです。

＜西瓜＞

毎年お盆前になると、仏前にお供えするもの、食材等を準備するのですが、今年父がお盆の為に準備した唯一の物は、こちら『西瓜』一つです。実はとっても大きいのです。青森の何処かの物産展で見つけてきた地物の大きさが売りの『西瓜』だそうです。仏前には、お花やお菓子、果物などをお供えしますが、今年はど～っんとコチラをお供えしました。親戚総勢20名が集まったお盆初日、これを食べ切るにはこの日しかない！と決めていた母は、さっそく切り分けたのです。味は･･･。大きさにこだわった『西瓜』だと納得した味でした。「こただに、おがらがすんだば、まんず、てへだんだ！（これ程までに育てるには、本当に苦労したと思うよ！）」を連呼する父でした。

そんな訳で、今年も、気持ちもお腹も満足の夏休み（お盆）を過ごす事が出来ました。今年は、青森もホント暑かったです。関東の酷暑を避けたはずが、全く変わらない暑さで、ここ数年の異常気象に、ただ熱い熱いとばかり言っていられないと感じた夏でした。

★ Wherever you go and whatever you have you just can't forget your favorite taste. That taste always reminds you home, your childhood or your mum which we called "HAHA NO AJI". So please tell me what your Haha No Aji ★

♤♤ 西ベンガルのカンタ刺繍を求めて ♤♤
伝統の工芸品から、農村女性の職業機会創出に向けて

Encounter to Kantha Embroidery
A heritage of West Bengal that brings about job opportunities to rural women

Miki Yoshida

午前5時。コルカタ最大のターミナル駅、ハウラー・ステーションは、既にゴッタ返している。汽車がでるまであと4分しかない。駅までガンジス川の支流を渡るのだが、旧ブリッジは混むから新しい橋を渡って行ってとドライバーに言ったのに、「Yes, Yes」と言いながら、ドライバーは勝手に旧ブリッジの渋滞に突っ込んだのだ。「5番線！」と叫んで、私は夫と義理の妹と駅を走った。4番線まで来ると、隣のプラットフォームは8番線！5番線はどこ？！3人に聞くと、「アゲ、アゲ（真っ直ぐ）」とそれぞれ違う方向を指差す。到着列車からは、大きな荷物を頭上や背中に乗せて、村から出てきた物売りが続々と降りて来る。進めない。野菜と鶏と布の山と人が駅に溢れる。あと一分。駅員がいた！聞くと、面倒くさそうに顎で、あっちと示す。4番線前方。あった！「5」のサイン。間一髪、ドアがない汽車に飛び乗った。珍しく定刻発車。座席を探し、流れる汗をウエットティシューで拭きながら、「この汽車、シャンティニケタンに行くのよね」と改めて不安になり、確認。大丈夫。良かった。

この旅は、西ベンガル州に伝わるカンタ刺繍を探し求める旅。この汽車に乗れなかったら、今回インドに来た意味がない。ようやく汽車に間に合ったものの、まだ不安はあった。どこに行けば、そのカンタ刺繍の源に行けるのか、ぼんやりとしかわかっていなかったからだ。

車中は、様々な物売りが来る。何でもある。お菓子や目の前で作るスナック。ゆで卵。靴下。文房具。甘いコーヒー。仙人のような風貌の歌手も来る。正直言って下手くそだが、同じ車両で歌をリクエストする乗客がいると、共に聴かざるを得ない。二胡の原型のような弦楽器を弾きながら歌うが、この楽器も玩具のような音しか奏でない。

コルカタから3時間余りでシャンティニケタンに着く。ここでインド人の夫の活躍。車の交渉である。駅前の車をチャーターする。外国人が顔を出すと値段が高くなるので、私は他人のふりをしている。定かでない目的地を探しながら行くので、少し気が利く運転手が良いが、贅沢は言っていられない。交渉まとまり、車は発車。多分こっちの方角、という方向へ走り出した。

ここシャンティニケタンは、ノーベル賞を受賞し、日本の岡倉天心とも交流のあったインドの偉人ラビンドラ・タゴール氏が晩年本拠地とした所である。彼が建てたタゴール大学があり、元インド首相のインディラ・ガンジー女史もこの大学の卒業生である。この大学には教室がない。授業は、木の下に円座して行われる。また、ノーベル経済学賞を近年受賞したアマタ・セン博士もシャンティニケタンに居を据える。この辺りでは、インテリな香りもする土地である。とは言え、それは一部のことで、村全体は日本的水準からすると、かなりバックワード。インドの農村では、今も牛の糞を燃料に使うが、この村でも、牛の糞を円盤型にして家の壁にペタペタ貼って乾燥させている。これを燃やすと、ものすごい煙が出て、横を通っただけで目が渋くなり涙が出る。

そろそろカンタ刺繍をご紹介しよう。日本では、まずお目にかかれない。インドにはサリーの美しさからも想像できるが、素晴らしいテキスタイルの伝統がある。カンタもそのひとつである。カンタというのは、そもそもは西ベンガル州に伝わる刺繍のステッチの名前であるが、今はその刺繍を施した製品もカンタと呼ぶ。その発祥はベンガルの農村部。村の女性が使い古して柔らかくなったコットンを幾重にも重ねた上に刺繍を施し、赤ちゃんの「おくるみ」を作ったのが始まり

である。まずコットンの布を三重、四重に重ね、それを縫い合わせる為に地縫いをする。これは日本の刺し子のようなステッチだが、1つの目が1ミリ程の、大変細かいステッチである。この布に、村の生活や動物、植物、鳥、魚等身近で楽しいモチーフや、幾何学的なデザインを描き、刺繍糸でカンタのバリエーションのステッチをする。刺繍の色糸は、もともとは村の女性のサリーの裾から色糸を抜いて使ったという。現在では、布はコットンだけでなく、シルクも使う。シルクの場合は布は重ねない。裏地をつけることはあるが、基本的には一重である。また、先にデザインとカンタ刺繍をして、そのアウトラインに沿って細かい地縫いをする場合もある。

私がカンタ刺繍に出会ったのは、結婚祝いに夫の身内からカンタ刺繍のベッドカバーを贈呈された時だった。目を見張った。すごい。細かい地縫いの上に、動物や村の人、植物がカラフルに刺繍され、何とも楽しい図柄だった。以前からテキスタイルに興味のあった私、ここでカンタ刺繍に惚れ込んだ。幸運にも義理の妹がインドでファッション・デザイナー。早速インドのテキスタイルと刺繍の手ほどきを受けた。古いカンタがある博物館にも通った。文献も調べ、カンタを知る人の話を聞いた。カンタを日本に紹介したいと思った。その理由はふたつ。日本で見るインドのテキスタイル製品は、戦後の日本の繊維製品がそうだったように、安いけれど質が悪いというイメージがある。スーパーの売り場で見かける500円の夏スカート。洗うと色落ちする綿のインテリア製品。カンタを始め、工芸価値のあるインドのテキスタイルに出会い、日本でのそのイメージを払拭したかった。もう一つの理由は、以前から私はインドで職業機会を創出するプロジェクトに携わっていたが、このカンタを日本に紹介し、質が良く、日本人の好みに合う製品を生産する機会を作ることができれば、ここでも村の女性に職業機会を作り出し、収入を得て生活が変わっていくことができる。ならば、カンタを作るところへ行って、何ができるか知りたいと思ったのが、今回のインドの旅の発端だ。

さて、駅前でチャーターした車は、農村を走り続けた。インドでは、年に一度、様々な工芸品の審査をし、優れた作者に章を与える。カンタもその工芸品のひとつだった。受賞者に会いたい。しかし調べても、漠然と居住地域はこの辺、というところまでしかわからない。が、その僅かな情報を元に、車を走らせていた。2時間後、「このあたりの村のはず」、と車を止めて、「○○さんを知りませんか」とベンガル語で夫が村人に聞く。知らない、と首を横に振る。それを何度も繰り返した。誰も知らない。やはり無理か・・・と思った。ベンガル語ができない私は、ここでは何の役にも立たない。「見つからなくても、皆が協力してくれて、ここまでしたら悔いはない」と思ったが、もう一度車を止めた。農作業の休憩をしているグループに聞いた。「知ってる」「知ってるって！」鳥肌が立った。ドライバーは教えられたとおりの道を行ったが、案の定、道に迷った。もう一度、通りすがりの村人に聞く。「○○さんを知りませんか」「ああ、知ってるけど、その人は別の村に嫁に行って、もうここにはいないよ」「どこの村？」「知らない。けど、その人の母親の家ならわかるよ。」目と鼻の先だった。到着。しかし、声をかけるのがためらわれ、家の前を何度も行ったり来たりした。突然、見も知らぬ外国人が来て、相手にしてもらえるだろうか。ドアは開いていた。誰か家にはいる。ここまで来て、何を躊躇しているのか。えい！と勇気を出して、「今日は。どなたか居られますかー」。一家のご主人が出てきた。「カンタを探しています。○○さんにお会いしたいのですが」というと、家に招き入れてくれた。カンタの作業場所は、二階だった。階段を上がる足が震えた。

それから2時間、私はカンタの布に埋もれていた。前述のインドの国の工芸賞を受賞した奥さんが出てきて、次々と作品を見せてくれた。この一家は、この村のカンタ生産の元締めでもあることがわかった。村の女性によるカンタも出してきてくれた。ここのカンタは、主にシルクに幾何学模様が施され、スカーフや、デュパタ（インドの女性が身にまとう大判のショール）、サリーになっていた。僅かだが、素晴らしいベッドカバーもあった。このカンタは、日本でも「美しい」と思う人々が必ずいる！私は特に素晴らしいと思う数点を求めた。

実はこの日、私はもう一人の工芸賞の受賞者を訪ねたかった。少し躊躇したが、聞いてみた。「ところで、同じ賞を別の年に受けられた△△さんをご存知ですか。ここからあまり遠くない所におられると思うのです

が」「知ってますとも。彼女は私の弟の嫁です。行ってみますか？私が連れて行ってあげましょう。」

車に乗って更に一時間弱。もうすぐ着きます、という時に、彼女はガタガタの農道をすれ違う車に手を振って止めた。知り合いだ。車には5－6人乗っている。何を話しているのか、私にはさっぱりわからないが、夫が通訳してくれた。「これから行く先の家族みたいだ。今から、この先の村の祭りに皆で行くところ。でも、せっかく客人が来たから、家に戻ってくれるんだって。」

その車に先導されて、もう一人の受賞者の家に向かうが、近づくと細い小道になり車は入れない。途中から雨上がりの泥道を歩く。外国人が珍しいらしく、気がつくと村の子供達が列をなして、後をついて来ていた。こんなに幸運にも、また目指す所にたどり着けた。ここのカンタもシルクが主体だが、先ほどのカンタとデザインの味が異なり、村の生活のモチーフを中心とした楽しい図柄が多かった。ここでも数点入手し、帰途についた。「カンタは収入を得る製品にできる」と確信した。しかし、こうした元締めが存在する社会では、製品の質やデザイン、価格もその元締めが握っている。質やデザインを日本でももっと受け入れられるように改善を重ねながら製品化するには、別途元締めが関わらない生産者を作り出さなければ難しい。けれども、それができれば、新たに別の村で女性の職業機会の創出に結びつく。

2006年9月。コルカタの郊外に、女性の職業訓練センターを立ち上げた。元締めがいない村の女性にカンタ刺繍のトレーニングを行い、一定の水準に達したら製品作成に入る。良い物を作れば製品が売れ、収入が増える、という良い循環を彼女達に理解してもらう。インド国内と日本で新規販路を開拓していく。トレーニングと制作には、運良く、別の年に国の工芸賞を受賞したカンタ制作者を先生に迎えることができた。難しいのは、現地での日々の管理だ。3年越しで、工芸品の保護を専門にする、信頼できるカウンシルとようやく巡り合い、そこに任せた。立ち上げの資金は日本で準備する。全体の企画も日本で行う。現在、6人の女性がトレーニングを受けている。相当質の高い作品を作れるようになったので、間もなく本番生産開始である。この間、作業者の品質に関する意識の向上をはかり、「ちょっとのシミだから大丈夫」はダメで、「No stain.　Straight line must be straight.」と繰り返した。シミの原因になる元を除く為に、錆びない刺繍針や、水洗いで落ちるデザインペンや、汗が落ちない工夫など、制作環境や道具も提供した。トレーニング中も、僅かだがお給料を支給し、諦めずにこの仕事を継続することが収入に結びつくようにした。この6人が本格的に生産に入れば、次のグループの女性のトレーニングが始められる。現在の規模での試みは、100人の女性に仕事を作ることはできないかもしれないが、できるところまでやっていきたい。1人でも、2人でも、これで仕事ができて収入が得られれば、ゼロ人よりずっと良いではないかと。

これは、私にとってライフタイムのプロジェクトである。しかし、今はこれを専門にしているわけではないので、時間が足りない。「もっとこうしたい」ということを実現し、また複数のプロジェクトを立ち上げて行く為に、協力者を募っている。デザインのアイディアや、販路の開拓、現地との事務連絡やプロジェクトの企画やマネジメント、資金調達路の多様化など、ヘルプが得られると、とても嬉しい。ご興味のある方は、一度是非ご連絡ください。もっとインドの女性の職業機会を作っていけるように・・・

(カンタ刺繍、女性の職業訓練センターにて)

吉田美紀 miki_mp_yoshida@yahoo.co.jp
連絡先:03-3457-1960

カルチャー…食？

チャットパダイ 啓子

「インドの人って毎日カレー食べてるの？ あなたのうちでも毎日カレー?あきない?」
インド人と結婚したことからよくうけていた質問のひとつです。話題として出されていることはわかりますが、色々な事を深く考えず、軽く、あるがままになじんでしまう私にはとても難しく、なんと答えてよいものやら、どう答えれば通じるものやら‥‥苦笑いしています。とりあえず日本人が家庭で食べているカレーとインドで毎日食べている料理は同じものではない、ということを説明し、後は質問者の興味の度合いにより私の判る、そして感じているインドの料理のことを付け加えます。今でこそインドだけでなくタイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、バングラデシュなどいろいろな国の日本でカレーとよばれている料理のレストランがたくさんできています。カレーとよばれるようになったのはヨーロッパ人がインドでスパイスで煮込んだ料理を見て「それは何か？」と聞いたら、インド人が料理の中身のことを聞かれていると勘違いしカリ(ヒンズー語で具、中身の意味)と答えたことからその料理がカリと呼ばれるようになったといわれるが定かではない･･･と何かの本に書いてありました。

食は、人間が生きていくうえで基本であり、もっとも大切なことです。インドも日本も他の国も、その地域により採れる物の違いなどで色々変化してきました。家庭によってもとても違います。それぞれ個々の生活習慣の違いからもいろいろな食事形態が発展してきているのでしょう。気候や日常生活での運動量、消化していくための内臓、そう遺伝子まで論議されているようです。

家庭料理はそれほど手をかけず種類を多く作らないのではありませんか。私の実家は毎朝ミルクと卵、ハムかソーセージ、サラダと果物のパン食でした。インドの実家での普通の朝食はミルク、パン、野菜料理と季節の果物。ゆったりした休日の朝はミルクティとビスケットではじまり、ゆっくり語らい、そしてバターを塗り日本でざらめと呼ばれる粒が少し大きい砂糖のかかったパンなどいつもの朝食がはじまります。休日は3食必ずスイーツが出ます。いろいろな種類のションデッシュ、ロショゴーラ…。

ところで、息子はあまり甘いものを食べないのですが、ロショゴーラが大好きでした。義姉がそれを知って、ビッグ・ロショゴーラ(直径10センチぐらいのしっかりシロップの沁みこんだ物)を3食続けて出してくれました。あれ以来息子はロショゴーラを欲しがらなくなってしまいました。息子が食べなくなり、私と夫も健康を考え、うちで作ることをしなくなりました。残念。

夕食は、私の実家では日本の調味料で味付けされた魚か肉の料理と付け合せ、味噌汁、煮物、酢の物、常備菜、漬物と水菓子(果物)が出ました。インドの実家ではスパイスで味付けされた魚料理(夫の実家では肉料理をあまり食べません。)、野菜料理 2〜3品、ダル、チャツニ、スイーツが出ます。調味料は違いますが、焼く、煮る、炒めるが基本の和食と、殆んどの料理に油を使い調理するインド料理との、味、食感の違いはありましたが、私は、互いの実家での料理の種類にはそれほどの違いを感じませんでした。味噌汁はだしを鰹節でとったり煮干でとったり、市販のだしの素を使ったり、味噌は米味噌、麦味噌、だし入り味噌、赤味噌、白味噌とそのときの材料や家庭によってちがいます。味噌汁と一緒にはできませんが、ダルは、クミンやたまねぎ、しょうが、トマト、コリアンダーの葉など、それぞれの家庭によりいろいろ入れるものが違います。ただ、最近、味、食感、調味料スパイスの違いはとても大切で、大きいということを実感しています。仕方のないことですが、互いに、育ってきた味をどこかしら求めているのです。母が作っていた味、料理を私はうまく作れません。普段、コクが出て、割と簡単にできるため、油を使った料理が多くなってしまいます。私の無国籍料理に私自身がうんざりしてつい外食。家族でインド料理か、イタリアン等に行き、私だけで時々友人と和食を楽しんでいます。

今、日本では健康によいといわれ、和食が見直されています。日本料理には懐石など、季節を味わい、五感で楽しむ料理があります。インド料理もフルコースで考えれば前菜から始まり野菜料理、スープと揚げ物、魚料理、肉料理、チャツニ、デザート、要は食感で、苦い・しょっぱい・辛い・すっぱい・甘い全部が味わえるような料理がご馳走の基本になっているようです。これは万国共通でしょうか。フレンチやイタリアン等もフルコースがあり、同じことが言えるかと思います。
つい最近インドへ里帰りしたとき、コルカタでピザやマクドナルドを見つけました。とても興味深かったのですが、食べさせてはもらえませんでした。インドの宗教的な理由からビーフを使っていないということ、

もっとインド人の口に合うようにスパイシーだとききました。日本では日本人の口に合うよう変えられてはいるのでしょうが、世界のいろいろな国の料理のレストランがあり、食べることができます。私が子供だったころと違い、子供同士で入れる店もたくさんあります。息子は恐ろしいことにとてもとても、ファーストフード店、コンビニに慣れ親しんでいます。朝マック勉強会と称してマクドナルドに朝7時に集まり試験勉強！日本の学校にあるような部活動の後には、コンビニに寄って喉を潤しチョット腹ごしらえ、など私には信じられない使い方をしつつ生活の中に溶け込ませています。日本で育ったインドの子供たちにはインドのスイーツが甘く感じられ好きではない子もでてきているようです。ツナマヨのすしロールは好きな子供たちが多いようです。
この間、カナダに旅行したとき、何日間か滞在している時に、食事をし、おなかはいっぱいなのに、なんだかまだおなかのなかが落ち着かなく感じられることがありました。そこで、モントリオールの地下街で日本食と称するランチを食べました。甘いような不思議な味で日本人の思うようなものではありませんでした。でも、息子と私は米を食べたことでおなかが落ち着いたのです。

インドも日本も米文化です。夫も1日に1回は米を食べたいと言います。来年大学に進学する息子は、2ヵ国の食文化をしっかり食べて育っています。日本からでて、寮に入れば当然寮の食事のみ、下宿しても自炊している暇はないでしょう。米、寿司、蕎麦、餡子類、パパのチキンカレーに飢えそうだと言っています。夫も日本人と結婚し、日本に暮らしているので、毎日、日本の調味料を使った無国籍料理を食べています。郷に入らば郷に従え、息子もなれていって欲しいものです。頑張ってね。

「集中」の度合い

東京ヨガセンター
羽成　孝

ヨガの修行は、すべて集中、瞑想、三昧とつながっていきます。そして最終的にそれらも乗り越え、魂の絶対開放へと進んでゆきます。では日常生活の中で心の動きをコントロールしていった場合、どんな状態になるのであろうか？例えば、動物の鳴き声や鳥の鳴き声を聞いたとき、その動物の鳴き声の意味、鳥の鳴き声の意味が、その音に心を集中することによって、分かってくるといわれる。

あらゆる生き物の出す声は、すべて或る精神過程によって生み出されるので、ヨガの達人は、それに集中する事によって、その意味が分かるのである。

集中 → 瞑想 → 三昧 は、別々の物ではなく、その集中の度合いによって別々な名前で呼ばれている。人が生きている間に経験したすべての事は、自分は覚えていないかも知れないが、頭脳細胞の中に根強く印象付けられていると云われている。これは催眠術などによってその記憶が呼び起こされるという事実によって証明されるであろう。

事実、深層意識に深く催眠をかける事によって前世の印象さえもよみがえらせる事ができるといわれます。すべての経験・印象は、我々の中のどこかに存在し、われわれの深層意識の中に十分入っていく事によって、それらの印象を生み出した経験をよみがえらせる事が出来るといわれるので、ヨガの訓練によって集中力を高めて、自分の深層意識の中に没入していく事によってそれらの経験を直視出来ると云われます。又、自然現象を深く観察することによって将来、起こりうる出来事に対しての暗示を感じとる事が可能になります。すべての現象はそれが現れる前に予兆があります。内部の目が開き、自然現象の内部を熟視する事の出来る人は、ある種の前兆を観察し、近い将来、起こりうる変化を感じとることが出来ます。

アユルベーダー（古代のインド医学）のお医者さんは、患者の脈を看るだけで、或る確実性を持って、その患者の危機的状態を言い当てます。これは予言ではなく、その先生の確実な観察から推論を引き出すのです。アユルベーダーの医者は聴診器などは、一切使わず、脈心だけで、すべて患者の状態が分かるといわれます。勿論、これは医学の知識と豊富な経験によって出来るものである。本当の前兆は起こるべき出来事の暗示を与えるサインなのである。これは事実私自身の経験で、アユルベーダーの先生に脈診のみで、すべての体の調子を言い当てられました。これは内部の眼が開き、高い集中力と洞察力の為に、原因・結果を追跡できる人のみが可能なのです。これはヨガによって総合的な集中力をつけた者のみが可能なのです。

インドの生活における「地域力」

ラキット工藤昭子（千葉大学大学院博士後期課程）

日本で注目される「地域力」

今年 7 月 16 日に新潟県で起こった中越沖地震や 1995 年 5 月の阪神淡路大震災をきっかけに「地域力」というものに日本中から大きな関心が寄せられた。都会の便利さや、「隣の人や何をする人ぞ」的な人間関係の浅い社会で震災にあい、「炊き出しをしてくれた自衛隊やボランティア、地域の人々に感謝する」被災者の姿は、改めて「地域力」の重要さを思い知らせる。しかし我々人間は怠け者にできているもので、地域の人が協力せざるをえない状況にならないと、自主的に地域に対する参加意識が高まらないのかもしれない。だからこそ、「地域力」という言葉に関心が寄せられているのだろう。

「地域力」の定義

「地域力」とは「地域資源の蓄積力、地域の自治力、地域への関心力により培われるもの」（WEBフリー百科辞典ウィキペディア）だという。

「地域資源とは、環境条件や地域組織及びその活動の積み重ねのこと」だそうで、いかに、普段から地域の人々が地域活動にかかわっているかということだ。

「地域の自治力とは地域の住民自身が地域の抱える問題を自らのこととととらえ、地域の組織的な対応により解決する力のこと」を指すという。ご存知のとおり町内会には自治会があり、夕方のパトロール活動や地域の催事で自治会が活躍することが多い。しかし、日常生活をわずらわしくさせる、自治会役員になりたがらない人が多いのも事実である。

そして 3 つ目の「地域への関心力」とは、「常に地域の環境に関心を持ち可能性があるなら向上していこうとする意欲があることで、地域に関心を持ち定住していこうとする気持があること」だという。

日本のサービスは、停電一つとってみても完璧にしようとする傾向が高いように感じる。東京電力は、「猛暑が続いた 8 月 31 日、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で 40.9 度を観測し、74 年ぶりに国内最高気温を塗り替えた」(c.f.WEB 読売新聞オンライン)ころ、8 月に毎日のように停電を危み、今夏の首都圏における最大電力供給能力を 6250 万ワット準備した（c.f.8 月 22 日付日本経済新聞）そうだ。さらに東京電力は一部の大口電力需要企業に送電を減らしたり、節電を呼びかけたりして、何とか危機をしのいだという。

天気予報も、至れり尽くせりだ。熱中症にご注意くださいとか、洗濯指数だ、紫外線指数だの、まったくご丁寧であった。日本社会はサービスを受けることに慣れてしまい、自主的な活動である地域の人による善意ある行動ともいえる地域のボランティア活動にまで完璧さを求めてしまっているような気がする。

以下、私のインドでの体験で感じたインド人の「地域力」について例をのべたい。本稿の「インド」とは西ベンガル州シャンティニケタンのことを主に意味する。

リキシャーマン（リキシャを引く人）のオルン

私は、怖いもの知らずで、すぐに人を信じるところがある。シャンティニケタンに住んですぐ、留学先の大学入学手続きや、子どもの大学付属幼稚園入園手続きに、あきれるくらい長い時間（1ヶ月以上、現地では珍しくないらしい）がかかった。私の場合、手続きをしているときに双子の4歳の子どもたち（あさひ・あすか）を見る人がいないので、いつも同じリキシャーマンであるオルンを雇ってリキシャーに子どもをのせたまま、手続きのため大学のオフィスに行った。やがて、オルンにわが子たちもなついていった。オルンには当時小学生の男の子が二人いて、奥さんと、子どもと一緒に、近々家族で町に一時的にきていたサーカスを見に行くのだという。それで、わが子もどうかというので、それはいい話だと思い二つ返事で承諾した。夕方7時には連れて帰ってくると言った。子供たちがオルン家族とサーカスに行っている間に、私は入学事務手続きもできるし、子供たちも楽しく過ごせると思い、すっかり安心していた。サーカスに行った日、夕方7時になる少し前に、大家のゴーシュ氏が私を呼んだ。「アキコ、ここは、インドだ。あなたが思っているほどみんながいい人ではない。オルンはいい人だと思う。でも外国人の子どもの誘拐事件もある。オルンの家がどこにあるか知っているのか」と聞いてきた。もちろん、私は「知らない」と答えた。オルンの家なんて知らなくても、私が「明日もリキシャーお願い」といえば、私が指定した時間に家の前にきちんと迎えにきてくれた。大家のゴーシュ氏は「夕方7時に、オルンが子どもたちを連れて帰ってくるというのだからそれまで待とう。でも今度からは、気をつけたほうがいい。何もないことを願っているよ」と言った。私は、大丈夫だと思いつつも時計をみた。夕方7時を過ぎても帰ってこない。いよいよゴーシュ氏の言うことも一理あると思い、少し不安になりはじめた。7 時より 20 分位遅れて、「ボディー（義理のお姉さん）」と

呼ぶオルンの姿が見えた。わが子たちも楽しそうにして帰ってきた。私はすぐさま大家のゴーシュ氏に「ありがとう。無事帰ってきました」と報告した。すると、大家のゴーシュ氏は「オルンの家がどこにあるか一度見に行ったほうがいい。私のドライバーを貸すから、何か手土産でも持っていってきたらどうか」といってくれた。郷に入れば郷に従えで、年配のゴーシュ氏の薦めに従うことにした。シャンティニケタンは、大通りを除いては自動車がほとんど通らないくらい小さな町だ。人を見ればどこの村の何という名前の家の人だと、素性を把握することが大切らしい。そうすれば、誰もが自分の家族に迷惑がかからないよう悪さをすることを控えるらしい。つまり、「地域力」ということなのだろう。

オルンの家に着くと近所の人たちがたくさん出てきた。オルンの家は壁が泥でできており床は固い土であった。大きい一間だけの家だったが、ベッド一つ置いてあり、こぎれいで、幸せに一家 4 人で暮らしている印象を見受けられた。「これからもよろしく」と言って、オルンの家を後にした。

（私たちは、こうして、ますますオルンを信頼し、子どもたちも「オルンカク（おじちゃん）」と呼んで、長いつきあいができるように思えた。しかしまたいろいろあって結局はつきあいが終わってしまうことになる。それはまた次の機会にお伝えしよう。）

カジェルメエ（下女）のプロバティ

すると、そこには、もう一人、見たことのある女性がオルンの家の前に立っていた。大家のゴーシュ氏のゲストハウスで使用人として働いているプロバティだ。私たちがオルンの家に行くことをドライバーから聞きつけて「ディディ（お姉さん）、うちにも寄って行って」という。ついでだから、プロバティの家にも行くことにした。通された家は掘っ立て小屋みたいな、今にもこわれそうな小さな家だった。中にはいると大きいベッドがあるだけで、あとは足のつき場のないくらい狭いところだった。そのなかで、「ディディ（お姉さん）、お茶のむ？」とプロバティが聞くので、断ったら悪いかと思い「うん」と答えると、なにやら取り出して紅茶を作り始めた。プロバティには当時小学生の女の子1人と幼稚園の男の子1人がいた。ガスがないのでケロシンを使った火でお湯をつくって、砂糖たっぷりのお茶を出してくれた。プロバティの家には電気もなかった。すぐ裏に妹夫婦の家があるのだとプロバティはいった。プロバティはご主人と事情があって別れたそうだ。だからすぐ近くにそのような家族がいるのは、女手一つで子ども二人を育てている母子家庭には安全らしかった。親子3人で暮らすため、私の住んでいたゲストハウスの家の仕事と、他2件で下女の仕事を3つ掛け持って、生計を立てていると話していた。ちなみに彼女には土日などの休みがなかった。
彼女たちには組合があるわけでもなく、雇用主の機嫌をとりながら毎日、朝6時頃～10時頃までと夕方3時～4時ころまで働く。午前中は、家の中の掃き掃除、拭き掃除、茶碗洗い、頼めば別料金で洗濯もする。料理は出来る人とできない人がいる。彼女たちは便器だけは掃除しない。それは雇い主が自分で掃除するものなのだとプロバティは私にいった。ごみはプロバティが持ち帰るのだが、どうやら途中の道端でポンと捨てているだけらしい。茶碗洗いと洗濯は蛇口から水を使えればラッキーで、厳しい雇用主では、井戸から手で水を汲んで作業しなければならない。はじめは、プロバティも蛇口から水を出して洗濯をしていた。しかしタンクの水がはやくなくなるので、プロバティに洗濯は井戸水を汲んでするように大家のゴーシュ氏が言ったらしい。それで私に、蛇口からの水で仕事できるよう頼んでほしいと訴えてきたことがあった。しかし、私の説得空しく、彼女は井戸から水を汲んで仕事をすることになった。

やがてデュルガプジャが近づくと、プロバティは私に「このサリーはもう一つ働いているところの奥さんがくれた」と見せてくれた。婉曲的に「何か買ってくれ」と訴えているのだ。立場がはじめから異なる下女たちは、はっきりものを言わないかわりに、いろいろな手法で婉曲的にアプローチしてくる。雇用主に対し不満があるときは、急に来なかったりする。来ないと、掃除機や洗濯機がないので、雇用主は仕事があるのに自分がやるか、複数の下女がいる場合はもう一人の下女に別に多く支払って仕事をさせるしかなく窮地に立たされる。弱い立場の人たちは全く様々なことをする。
下女たちは誰がどこの家で仕事をしているか常に情報を交換していることが多い。雇い主の奥さんたちもどの下女が使用人としてよく働くか情報を交換していた。私たちが帰国するときは、あさひとあすかの幼稚園の先生が、プロバティの働きぶりを私に聞いてきて、私たちが雇わなくなったら紹介してほしいといってきた。
情報を確保するためにも、地域の人々への関心が高いのであろう。

インドのロードシェーディング（停電）

シャンティニケタンでは暑い日はほぼ毎日、冬でさえも3日位に1日は夕方7時～9 時ころの間、停電になることが多かった。コルカタに滞在したことが何度かあったが、やはり夏場などは夜 7 時頃から 10 時頃まで電力が復旧しなかった。停電になれば暑さと暗闇の中で晩御飯の用意をしたり、外に出て蚊と戦いながら涼んだりするということが珍しくなかった。開き直

って考えると、暗闇は太古の昔から存在していたのだ。シャンティニケタンでは停電になると、夜空にこれほど星があったのかというくらい、無数の美しい星が見えた。そして蛍が飛んでいたりもした。夜であっても月が照っていれば随分、視界が開けた。平安時代に、日本で貴族たちが月を和歌に詠んだ気持ちがわかる気がした。

家にいるときに、停電になると、私たち親子は暑さのため仕方なくベランダや庭にろうそくや充電式ライトを持って外に出た。インドの停電は夕方から夜に起こることが多いのだ。すると4歳の子どもたちは、手をパンパンして、蚊をたたいた。しかし、暗闇の中で灯されたライトには無数の虫が寄ってくるのは仕方がない。いくらパンパンやってもきりがないのだ。テレビも見られないし、食事の準備も暗闇では不便でできないし、出かけるにも暗くて難しい。何もすることがないので、お絵かきをしたり、ティクティキ(とかげの一種)が虫を食べるところをみたり、今日の幼稚園でのことを話したりして過ごした。隣人たちは、どうせ家の中にいることが暑くてできないので、門の近くまで出ていって、うちわを片手に井戸端会議を始めたりする光景もよく目にした。停電による暗闇の中では、人々は余計にコミュニケーションとるしか時間を有効に過ごせないのかもしれない。

昼間の泥棒

インドでは昼から日が暮れる夕方 5 時くらいまでは暑いので、体力を消耗しないようにするためか家の中で過ごす人が多い。昼食やお風呂、お昼寝をして過ごし、3時から4時ころに起きてお茶を飲む。下女が3時ころやってきて昼食の片付けをする。4時から5時ころになると夕食の前にティフィンとよばれる軽食をとる。

私たちは昼寝の習慣がないので昼に家にいても起きていることが多かった。私はドアの近くにいつも自転車を置いていた。夜なら家の中にしまってから寝た。皆がうたた寝しているはずの真昼間、うちには元気は二人の男の子が暑い昼に関係なく遊びまわっていた。ある日、あさひが真昼間、家の外に出た。するとすぐ家の中に戻ってきて、「マミ、お外におにいちゃんいる」という。私は何で人がいるのかわからず外に出てみた。すると若い兄ちゃんが軒下にいて「大家さんに頼まれて」と何かを見に来たような話をした。私はそうなのかと思い、また家の中に入った。しばらくして、また、ある日子どもたちが真昼間に家の外に出ると、また「誰かいる」という。それで見に行くとまた同じ兄ちゃんが普通歩く場所ではない妙な場所にいるではないか。私は絶対にこの男は怪しい人物だと感じ、すぐに隣のおばあちゃんを壁越しに呼んだ。するとおばあちゃんは昼寝を起こされ、「どうしたの」といって窓から顔を出してくれた。事情を話すと、おばあちゃんは「お前の顔見たからな。二度とくるな」といって、その怪しい若い男を追っ払ってくれた。おばあちゃんの推測にでは、私が昼にドアの前においていた自転車を狙って泥棒に入っていたのだろうという。私以外に隣のおばあちゃんにも顔をしっかり記憶された泥棒未遂者はそれっきり来なくなった。

やっぱり、隣近所とは仲良くしておくものだ。また、小さい町なので「顔を覚える」という手法が、危険回避に利いているらしかった。

子どもへの関心の高さ

私が子連れで住んでいたせいもあるのだろうがインドの人々の子どもに対する関心の高さを感じた。雨上がりに庭で子どもを遊ばせていると、道を歩いていった下女風の一団が「shap asbe(蛇でるよ)」と暗に雨上がりにすぐ外で遊ばせるのは危険だということを教えてくれた。道を子連れで歩いていて子どもが転んで足をすりむくと、反対側から歩いてきたおじいさんが「Dettol ragao(“デトル”塗りなさい)」といって消毒剤をすぐ塗るように言ってくれた。何だか、地域ぐるみで子育てを応援してもらっている気がした。逆に、子連れで店に行ったとき、子どもが店の前にぶら下がっていたガムを手で触れただけで「あんたの子が盗んだじゃないか」と店主が疑ってきたこともあった。私はお客の行動をきちんと見ているべきなのは店主の方なのに、店主が勝手に他の客とおしゃべりしたために、たまたま店にきていたわが子を含むほかの客をきちんとみておらず、たまたまわが子がガムを触っていただけで泥棒呼ばわりするなんて、あなたの職務怠慢じゃないか、と言い返したことがあった。インドの「地域力」は、よきにつけ悪しきにつけ、お互いに関心を持ち合う精神があることで作られているような気がした。

インドの「地域力」と日本の「地域力」

インド社会と日本社会における「地域力」の意味する範囲は当然異なるだろう。

「地域力」とは「地域資源の蓄積力、地域の自治力、地域への関心力により培われるもの」であると前に触れた。

インドでの「地域力」とは、安全を確保するためであったり、情報を確保するためであったり、他の人に関心もってもらうためにコミュニケーションをとったり、子どもに共通の関心があるために、地域の人々が作り出した力なのではないだろうか。「自治力」は、インドではまだまだ個人レベルで確保するしかないかもしれないが、「地域力」によりかなり自治力が補われているように思う。「地域の人への関心力」については、知らない人でも子どものために話しかけたり、隣人たちがよくコミュニケーションをとっており、日本よりとて

も「地域への関心力」が高くそれを行動に移していたような気がした。
日本社会の人々はサービスを受けることに慣れてしまい、自主的な活動の地域ボランティア活動にさえ完璧さを求めてしまっているような気がする。そのため忙しい毎日を送っている人々がますます地域へのボランティア活動（とくに役員としての）参加しにくい構造になっているのではないだろうか。「できる範囲」でしか協力できないのに、引き受けるからには「きちんと」他人に迷惑をかけないようにしなければならない、という完璧を求める志向を持つ人が多いために「地域力」にとって大切な、「地域への関心力」が阻害されているように思えた。
デュルガプジャは皆が関心を持ち合うことにより、自分の周りに喜びにあふれた家族や仲間がいるということを改めて再確認する、いわば「地域力」の結晶のような日なのかもしれない。その「地域力」を感じることにより、新たに自分も周りの人々も気持ちを入れ直して再スタートできるのかもしれない。

アシールバドゥ

スデブ・チャットパダイ

やく四十年前のコルカタのある家の朝。いつものようにこの時間帯は一家にとってもっとも忙しい。お母さんは家事手伝いの人にいろいろな指示をしている最中だ。お父さんは昨日買ったものでなにが残っているのかを調べ、その日に補充すべき食料品を買いに近くのバザールに出かける準備をしている。子供たちは朝ごはんを済ませ、もうすぐ学校へ出かけなければならない。その中でいつものように冷静な小学校六年生の長男。一見普段と変わらぬように見えても、いつもより本人は気が重い。それもそのはず。今日は年に一度だけ行われる学期末の試験が始まる日。昨晩、忙しいお母さんから今日の試験攻略法を助言してもらった。今日は、一年間一生懸命に勉強した成果を試される日。準備は万全だが、学校へ行く前に忘れてはならないことがある。まずは「タクルゴル」（祭壇専用の部屋）に足を運ぶ。神様の祭壇前に正座し、頭を地面すれすれまでおろし、祈りをささげる。「今日の試験はうまくいきますように」と。そこで得た「アシールバドゥ」で自信を高める。あとは両親からももらわなければ。急いで、お父さんのところに行き、そっと足に触れ、その手を自分のおでこにつける。お父さんも自然に息子の頭に触れ、無言で「アシールバドゥ」を与える。次はお母さんのところへ行き同じように行動を繰り返し「アシールバドゥ」をもらって急いで家を飛び出す。お母さんは息子のその後ろ姿を見送りながら「ドゥッガー、ドゥッガ」とつぶやく。このような風景が見られるベンガルの家庭は最近少なくなったようだが、弟と両親が住む小生のコルカタの家では今でもその伝統が受け継がれている。

ベンガル語の「アシールバドゥ」は「恩恵」という意味。ヒンドゥ教の人生は「アシールバドゥ」なしでは成り立たない。それは、神からいただくものもあれば、両親や自分より年上の人々からいただくのもある。この世に生まれてきたこと、末永く幸せに生きることなど、すべてこのようなアシールバドゥのおかげ、宗教熱心なベンガルの人々はそう信じている。それが習慣でもなければ、常識でもない。存在や生活の一部であり、なくてはならない安心感を与えてくれるものである。普段もらえる「アシールバドゥ」は特にしきたりはないが、結婚式のような人生の節目の大事なイベントでは、その行事に相応しい「アシールバドゥ」のしきたりがある。ヒンドゥ教の行事では自然のものを題材にしてしきたりを決めることが多い。「アシールバドゥ」となると欠かせないのは「ダン」（稲粒）と「ドゥルバ」（若草）。ベンガル人の祖先はアーリア系といわれており、稲はもともとアーリア系の人たちに食料としてなじみの薄かったと思われる。しかし、ガンジス川が流れる周辺地帯は稲の豊作は盛んで、そこに住みついたアーリア人も次第に現地の豊富な食料になれ、その食料を代表する稲がやがて裕福さを表すものになったのである。そして、特別な「アシールバドゥ」の行事に、「人生は裕福になるように」と願いを込めて、稲の粒が使われるようになったという。一方、「ドゥルバ」の方は、湿気が多い亜熱帯地方にどこにでも生える植物で、手入れしなくても自然にのびのびと育つことから、丈夫で長寿になることを象徴する。このことから、「元気で長生きするように」と願いを込めて「アシルバドゥ」を与える行事に「ドゥルバ」が使われるようになったと言われている。

毎日神を崇拝する行事は神からの「アシールバドゥ」を願うもの。そのことから、「プジャ」（神の崇拝）にも「ダン」と「ドゥルバ」は欠かせない。「ダン」はバザールにて調達し保存できるが、「ドゥルバ」は毎日新鮮なものでなくてはならないので、コルカタの小生の家では、家の中庭で生えるものを使う。東京で行われる「プジャ」でも毎年「ダン」と「ドゥルバ」を欠かさず使用しているが、特に動物の排泄物でけがされていない新鮮な「ドゥルバ」の調達は、モンジュリカディ（羽成）のおかげで助かっている。

Book Review

জাপান ও ভারত দু দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের চেষ্টায় নিয়োজিত লেখক লেখিকাদের মধ্যে চারজনের লেখা বই-এর পরিচয় করিয়েছেন **শাহানাজ রেজা** ।

পূবের হাওয়ার রঙ

জাপান দেশে – আমার ঘরে সীতা রায়

থমসন প্রেস

এ বই পড়ার এবং দেখার। এবং অনুভব করার। শ্রীমতী সীতা রায় এ বই লিখেছেন এবং এঁকেছেন। এ বই বাঙ্গালীদের জন্য এবং না-বাঙ্গালীদের জন্য। আর একটু খোলসা করে বলে ফেলা যাক। শিল্পী সীতা দেবীর জাপানে বসবাসকালীন বেশ কিছু ছবির এই সঙ্কলন। কবি সীতা দেবী সেই ছবির সঙ্গে আরও এঁকেছেন কিছু অনু-কবিতা ('হাইকু' ও বলতে পারেন)। সব মিলিয়ে যা হয়েছে 'ছবির দিনপঞ্জী'।

আরও একটু খোলসা করে বলার জন্য 'Forward' থেকে কিছু লাইন পড়ে ফেলা যাক, যা লিখেছেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রী পরিতোষ সেন - 'Her art was vitally shaped by her experience of living in Japan, for several years at a stretch, where her husband Jyotirmoy Ray held the post of Chief Executive of an Indian engineering Consultancy firm. During this period she developed a profound love and admiration for all things Japanese, including Japanese art……The technique and style had evolved from a blending of distinct Indian and Japanese sensibilities; quite expectedly and wisely, she trained under a Japanese Guru during those years. ..... she sketched, and then animated the scenes with a gentle wash of watercolors. Simultaneously she also began to record her poetic musings around the images she had captured, words that eventually became part of the over-all painting surface. These writings are in Bengali, which happens to be Sita's mother tongue. They have been very ably translated by Dr. Anindyo Roy, a professor of English at Colby College in Manie, USA. The translation takes the form similar to *Haiku* poetry that originated in Japan.'

প্রচ্ছদ নিয়ে এ বইয়ে ছবি আছে মোট ৩৪ টি। যার প্রতিটিই এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করে পাঠক ও দর্শকের মনে। যেমন - একটি পর্দার ছবি। বস্তুত পর্দা ভেদ করে বাইরের পৃথিবীর রঙের ছবি। সেই রঙ এবং বেরঙ বড় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পাশে হাইকু লেখা হয় -

পর্দার আড়ালে
ঘরে বাইরে
রঙের ইশারা।

কিম্বা আরেকটি ছবিতে, যা বৃষ্টির - সেখানে বৃষ্টি ও ফুল একাকার হয়ে যায়। 'বুকের ভিতর ঝাপসা ছবি, তুমুল বর্ষণে।' বসন্তের এক ছবিতে থাকে 'মাতাল ফুলের ইশারা'। সেই ইশারাতেই লেখা হয় 'আকাশ ঝরা আলো'। সেই আলোর জন্যই বোধহয় সৃষ্টিশীল মানুষের এই অস্থিরতা, তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে-

Walking and sleeping
Among light and darkness.
In the corner of my room
And among the winding paths
Lie joy and sorrow.

শ্রীমতী রায় ভুমিকায় লেখেন 'প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে - উত্তর পুর্বে যেখানে তিনটি ভূ-ত্বক এসে মিশেছে- সেই জটিলতার ওপর মাথা তুলে ভেসে আছে কতগুলো দ্বীপপুঞ্জ। সেই দ্বীপগুলি নিয়ে জাপান দেশ। ভোরের আলো সবার আগে ঝরে পড়ে সেই দেশে- সূর্য ওঠার দেশে। সাদা-কালোর স্তরভেদে মেঘে ঢাকা সুমিয়ে আঁকার দেশ। কাগজ - চেরীফুল আর ভূমিকম্পের দেশ। সেই দেশে কাটিয়েছি বেশ কয়েক বছর। যখন তখন সে দেশের মাটি দুলে উঠে জানিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্ব, সে কাঁপনে আজও মন দুলে ওঠে। মনে পড়ে কত কথা, কত ঘটনা, কত দৃশ্য - সেই সব দৃশ্যের ছবি, আশেপাশের রেখাচিত্র ভাসিয়ে রেখেছি মনের সময় স্রোতে – রঙে রেখায়।'

রঙে রেখায় তাঁর এই বই যেন খুব অল্প সময়ে এক বৃত্ত পরিক্রমা। যে পরিক্রমার শেষে আমরা প্রাত্যহিকতায় ফিরে আসি আবার, কিন্তু একটু উন্নীত অবস্থায়। সেই উত্তরণই 'জাপান দেশে...' -র শ্রেষ্ঠ ফসল ॥

হাইকুর অন্দরমহলে

জাপানি হাইকু- কল্যাণ দাশগুপ্ত

সমতট প্রকাশনী, কোলকাতা-১৯

পুরোনো পুকুর
ব্যাঙের লাফ
জলের শব্দ

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এ 'হাইকু' এক সেতুবন্ধন বাঙলা ও জাপানী কবি মানসের। সেই কাল থেকে আজকের সময়ের এই দীর্ঘপথ শুধু বিস্তৃতই নয়, বিচ্ছিন্ন। সেই ব্যক্তিগত ছেঁড়া ছেঁড়া প্রচেষ্টা অবশেষে এক দিশা পায় শ্রী কল্যাণ দাশগুপ্তের 'জাপানি হাইকু' তে এসে। শ্রী দাশগুপ্ত বহু ভাষাবিদ। তাঁর দীর্ঘসময়ের গবেষণা ও ভালবাসার ফসল এই '..হাইকু'। মূলত এটি 'জাপানি হাইকুর বাঙলা অনুবাদ' হওয়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবেই জাপানি ভাষা, তার উচ্চারণ, লিখন পদ্ধতি, 'কানা' ও 'কানজি' র ব্যবহার (এবং জটিলতা)-এর সুনিপুণ সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর জাদুকরী দক্ষতায় এবং গভীরতায়।

অনুবাদ প্রসঙ্গে শুরুতেই তিনি বিনয় প্রকাশ করেন, "যোগ্যতর হাতে পড়লে অনুবাদের মান উন্নীত হত সন্দেহ নেই, তবে সান্ত্বনা এটাই যে উন্নতির শেষ নেই, ভালোরও ভালো আছে। বস্তুত এ-বই এর অন্যতম উদ্দেশ্য অনুবাদ কর্মে নয়, মাতৃভাষায়ই হাইকু লিখতে আকৃষ্ট করা বাগ্‌দেবীর স্নেহধন্য বঙ্গসন্তানকে।" এবং তাই, কার্যক্ষেত্রে সবক্ষেত্রেই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মূল আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশ করা, তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে সন্দেহ নেই।

শ্রী দাশগুপ্ত তাঁর এই অনুবাদ সঙ্কলন সাজিয়েছেন রচয়িতার জন্মবর্ষ অনুযায়ী। কবি ইহারা সাইকাকু(১৬৪২-৯৩) থেকে শুরু করে সমসাময়িক কাতোও মিনাকো পর্যন্ত। তারপরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হাইকু, প্রতিবন্ধী কবি ও ছেলে-মেয়েদের পুরস্কারপ্রাপ্ত হাইকুর একত্রীকরণ তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে শুদ্ধ করে।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় মুরাকোশি কাসোকি লিখে যান
পাহাড়ে নিদ্রা
আগুন পোয়ানোর মত
তোমার সান্নিধ্য।

চতুর্থশ্রেণীর তানাকা হিদেহারুর কী অসামান্য রোমান্টিক উচ্চারণ -
ঝরে পড়ে বুঝি
আমারই দু-হাতে
ছায়াপথের তারারা।
প্রসঙ্গত, "আয়তনে হাইকু অবশ্যই হ্রস্ব; ইংরেজিতে হাইকু সম্বন্ধীয় আলোচনায় বলা হয়, হাইকু হল মাত্র 17 syllable- কবিতা। ঠিকই তাই। 17 সংখ্যায় ভুল নেই। কিন্তু ভাষাশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী এখানে syllable শব্দটি সুপ্রযুক্ত নয়। বলা উচিত, হাইকু ১৭-"মোরা"-য় গঠিত। ... এ ১৭ টি বিভক্ত যথাক্রমে ৫,৭ ও ৫, এই তিনটি অংশে।" আবার এর ব্যতিক্রম হিসাবে শ্রী দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন যক্ষারোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় ওজাকি হোওসাই রচিত ৯ মোরার এক অমর হাইকু - "কাশলেও একা"।

ছিপছিপে জাপানী শরীরের মত হাইকুর শরীরও বড়ই তন্বী। সেখানে বাহুল্য একেবারেই ব্রাত্য। হাইকু জগতের সম্রাট কবি মাৎসুও বাশোও -এর বেশ কিছু অনুবাদ পাই আমরা এখানে -
কুয়াশার ছোঁওয়া
অনামী পাহাড়ে
বসন্ত বুঝি এলো।
আরেক বিখ্যাত কবি য়োসা বুসন -
ধান কুড়িয়ে
রোদের দিকে
এগোচ্ছে (ওরা)।
কিম্বা
ক্ষীণধার বৃষ্টি
একটি নদী
দু-টি বাড়ি।
এমনি ভাবে বহু বিখ্যাত-স্বল্পখ্যাত-অখ্যাত হাইকুর অন্দরমহলে পাইচারি করেছেন শ্রী দাশগুপ্ত - পাঠককে আকুল করেছেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ব্যবহার, 'কানা'-'কানজি' ব্যবহার, ছন্দ সব কিছুতে তাঁর পান্ডিত্য ও তার প্রকাশ, পাঠককে ঋদ্ধ করে, বিস্মিত করে।

আর এক কবির নাম উল্লেখ না করলে, এ আলোচনা অসম্পুর্ণ থেকে যাবে - তিনি কোয়াবাসি ইস্‌সা। যিনি লিখেছিলেন -
মানি
এ জগৎ শুধু শিশিরবিন্দু
তবুও .... তবুও তো ....
অথবা,
আমার সঙ্গে
খেলবি আয়
মা-হারা চড়ুই॥

স্মৃতি-বিস্মৃতির দিনলিপি

অরণ্যের রাজবাড়ি - নাওকি নিশিওকা

পূর্বা, কোলকাতা-৯

জাপানের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্, ছোটগল্পকার, চিত্রকর ও ভারতীয় লোকসাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিশারদ নাওকি নিশিওকা। তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা পাঁচটি ছোটগল্পের সংকলন "অরণ্যের রাজবাড়ি" বাংলা সাহিত্য জগৎকে আরো বেশি পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। এ গ্রন্থের নামকরণই পাঠককে হাতছানি দেয় রহস্যঘেরা ঐশ্বর্যের জগতের। গল্পের সাথে সাথে পাঠকও পেতে থাকে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান - যা আমাদের চিরপরিচিত বাংলার মাটিতে মিশে আছে, যা প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় আমদের চেনা ঘরের কোণে, বেঁচে থাকার প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে যা আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হয় আমাদের রক্তের মধ্যে। আমাদের নিত্যদিনের দেখা সেই সব ছোট ছোট ঘটনা - যা আমাদের এতই চেনা যে আমাদের দৃষ্টি স্থিত হয় না, তেমনই চিরন্তন, স্বাভাবিক, সহজ ঘটনাগুলোকেই লেখক বাঙালির রোজনামচা থেকে তুলে এনেছেন তাঁর এই পাঁচটি গল্পে।

গ্রন্থের ভূমিকায় বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং লেখকের বাংলা ভাষা শিক্ষক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছেন - "বহুদিন এদেশে থেকে এদেশের ভাষা শিখে বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতিকে তার গভীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখেছেন জেনেছেন চিনেছেন নাওকি নিশিওকা। জাপানি শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখা শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বাঙ্গালি জীবনের এক বিচিত্র, অভিনব চালচিত্র। জাপানি গল্পকারের লেখা পড়তে পড়তে আমরা নিজেরাই যেন নিজেদের নতুন করে আর একবার আবিষ্কার করার সুযোগ পাই।" এই উক্তি যে কতটা যথার্থ তা পাঠক বুঝতে পারেন সহজ, সরল, স্বতস্ফূর্ত আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলো পড়তে পড়তেই।

যেমন 'পুরনো বটগাছ' গল্পে এক বাল্যবিধবার চিরাচরিত জীবনযাত্রার পরিচিত যে ছবি লেখক এঁকেছেন তা নতুন করে পাঠক মনকে ছুঁয়ে যায়। "পিসিমার খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বউ হিসাবে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করতে যাওয়ার আগেই তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বাবার রেখে যাওয়া ঘরের বাইরে আর একবারও যেতে পারেন নি। সাদা থান পরে সেই বাড়িতেই রয়ে গেলেন।" আবার 'গঙ্গার মোহনায় পটুয়া বাড়ি' নামক গল্পে সমাজের তথাকথিত নিচু স্তরের মানুষের মধ্যে যে মানসিকতা লেখক লক্ষ্য করেছেন এবং সেই কথা স্বীকার করেছেন অকপটে "স্বপনের জন্য সুধীরবাবুর উদার আন্তরিকতা দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গেল।" আবার সমাজের জাত-পাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদও লেখকের মননশীল দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। বাল্যবন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রিত শান্তনুকে নীচুজাতের হওয়ার জন্য নিজের পাত্রটাকে ধুয়ে রেখে আসতে হয়েছে।

এসবের সাথে সাথে প্রকৃতিপ্রেমী লেখকের গ্রামবাংলার বহু-চর্চিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শে রূপকথার রাজ্য হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে 'অরণ্যের রাজবাড়ি' গল্পটির একটা অংশের কথা বলতে ইচ্ছা করে। "গরুর গাড়িটা রাঙামাটির পথ ধরে হাঁটার চাইতে একটু বেশি গতিবেগে চলছিল। গ্রামের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর পথের দু-ধারে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় - ধানক্ষেত ছড়িয়ে আছে। পাশের একটা ধানক্ষেতে এক কৃষক লাঙল দিচ্ছিল গরু দিয়ে। লাঙল চষা ধানক্ষেত থেকে জলজ উদ্ভিদ এবং ভেজা মাটির মিশ্রিত গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল। সেই গন্ধ এবং তাপমাত্রা জাপানের জুন মাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। দূরে সামান্য উঁচুনীচু ঢেউখেলান জমিতে বড় বিস্তারিত বনভূমি দেখা যাচ্ছিল। তার উপরে মেঘের ছায়া পড়ে আলো ছায়ার খেলা চলছিল।" এই প্রসঙ্গে যে কথাটা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তা হল জাপানি তুলিতে লেখকের নিজের আঁকা ইলাস্ট্রেশানগুলি যা বইটির অতিরিক্ত আকর্ষণ, বলা যেতে পারে পাঠকের বাড়তি লাভ।

আমাদের বাংলাকে ভালবাসার, আন্তরিকতার চোখ দিয়ে দেখে এবং তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর কলম ও তুলি দিয়ে যে ছবি নাওকি নিশিওকা এঁকেছেন - এই দেখা এবং বর্ণনা বোধহয় কোন বাঙালি লেখকের পক্ষে সম্ভব হত না। এখানে লেখক, শিল্পী, মানুষ সব মিলেমিশে একাকার। এগুলো যেন কোনো গল্প নয়, লেখকের প্রাত্যহিক দিনলিপির কয়েকটি ছেঁড়াপাতা, যা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ ॥

বাতাসের কথা

インドの風・日本の風 (ইন্দোনো কাযে নিহন্‌নো কাযে) - কোকুবো শুভা চক্রবর্তী
নিয়োগি অফসেট প্রা. লি., নিউ দিল্লী

ভারতের মেয়ে বর্তমানে জাপানিবধূ কোকুবো শুভা চক্রবর্তী, কয়েক দশক ধরে জাপানের টয়োটা শহরের বাসিন্দা। স্বামী জুনপেই কোকুবো। তবে এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। যে কারণে তিনি আজ ভারত ও সেই সঙ্গে জাপানের শিল্পীমহলে সমাদৃত, সেটি হল তিনি একজন গুণী নৃত্যকলা বিশারদ।

গৃহ মানুষের প্রথম পাঠশালা। এই গৃহেই শিল্পী বাবা এবং মা-এর হাত ধরে তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ। এরপর মমতাশঙ্কর, থাঙ্কুমনি কুট্টি প্রমুখ ভারতখ্যাত শিল্পগুরুদের হাত ধরে তাঁর কলাবিদ্যার পূর্ণতা লাভ।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয় সংস্কার, আচার-আচরণ, মানুষের জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জীবনের পথ চলার শুরুটা সকলের ক্ষেত্রেই একটু অন্যরকম। শ্রীমতী শুভার ক্ষেত্রেও এর কোন অন্যথা হয় নি। শুভার কথায় - "একজন ট্যুরিস্ট হিসাবে একটা দেশকে দেখা, জানা আর সেই দেশে থেকে বিশেষ করে সেই দেশের মানুষকে বিয়ে করে দেশটাকে দেখার মধ্যে যে প্রচুর ফারাক থাকে, তা এর আগে টের পাইনি।" ভাষার সমস্যা, খাদ্যাভাসের সমস্যা এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক ছোট ছোট সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁর স্বামী ও বন্ধু - জুনপেই কোকুবো।

শুভার লেখা বই "ইন্দোনো কাযে নিহন্‌নো কাযে" (ভারতের বাতাস - জাপানের বাতাস) দুই দেশের নানা অভিজ্ঞতার রঙে রাঙ্গানো, নানা চিত্রে চিত্রিত। এবং ভাষা জাপানি। তাই আমরা, বাঙালি পাঠকরা আনন্দিত হই, বিস্মিত হই এবং বঞ্চিত হই। কোকুবো শুভার অনুভব কি আমরাও পেতে পারি না?

インドの風・日本の風
馬渕 伸子

日本語クラスのインド人生徒から、コクボ シュヴァチャクラバティ著「インドの風・日本の風」を借りて読んだ。インド人の本を読むのは初めてであった。私の住まい近辺の本屋には旅行ガイドブックはあってもインド人の著書は見かけない。

ここ数年、東京ではインド人の数が急増している。彼らの多くは IT 技術者とその家族だそうで、優秀であるというイメージが、日本人に良い印象を与えているが、実際にインドの人達とインドという国をよく知る日本人は少ないと思われる。日本とインドは異文化の国である。違いがあるということは互いに学びあえることがあり、魅力的なことである。私は生徒達からインドの話を聴くのも、日本のことを紹介するのも好きである。この本には、新しい環境にとまどいながらも、異文化を学び、インド文化を伝えて文化交流をする女性の姿がある。

著者は1994年日本人の伴侶と来日し、豊田市で新生活を始めた。インド舞踊の公演で、すでに二度来日していたので、日本のことを知っていたつもりだったが現実は違った。日本語が分からず、英語を話す日本人もいない環境で人とコミュニケーションをとれず、「電話恐怖症」や「対人恐怖症」になってしまう。しかも英語も出来ずに欧米の真似ばかりしている(と著者には見えた)日本人が理解できない。

異文化の中でいかに精神の調和を保つかは、本人の努力次第である。一番の良き理解者である伴侶は、その状況を打破すべく日本語を教え、休日には京都や奈良に案内し日本の伝統文化に触れさせた。元来、インドと日本は互いの文化を取り入れ浸透させて来たこと(インドで生まれた仏教は日本に伝わった。言語、文明にもインドから伝来されたものがある。「今昔物語」ではインドが語られ、歌舞伎にも影響が見られる。インドの「リキシャ」は日本の「人力車」から来ているなど)を知り、歴史的な寺院や庭園に心を惹かれ、日本人の自然に対する想いの深さ、日本文化の季節の風物詩を美しいと感じるようになって、行動する意欲が湧いて来る。

日本人からは茶道を学び、インド舞踊教室を開いて日本人に教え、公演、講演を通してインド伝統文化の紹介に努めた。日本人生徒達を引き連れてインド公演に二度も参加し成功させた。目を見張る活躍であり、真の国際交流である。

海外で心しなければならないことは、自分の背中に自分の祖国を背負っているプライドを忘れてはいけないという信念と、異国に暮らしているからこそ自分の根っこがどこに繋がっているかが明確に認識出来るという考えは、かつてニューヨークに住んでいた私が心に抱いていたことでもある。

日本が、古き良き伝統を守りつつ、新しいものをどんどん取り入れ、そぐわない慣習を改革していく精神の均衡がどのようにして整合性を持ち、人々の心に落ち着いてしまうのか「不思議」でならないと著者は記している。

先進国と呼ばれる国々で活躍する沢山の若いインド人達が、どのような異国の文化を持ち帰り、めざましい経済成長をバックに、広大で、多様性を秘めたインドをどう変貌させていくのか興味が深い。